

এক বস্ত্রে দু'টি কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল

এক বস্ত্রে দুটি কাঁটা

বাবার মাঝে



২০-এ, অক্ষিয়া ষ্ট্রট
কলিকাতা-৭০০০০২

ଅଥୟ ପ୍ରକାଶ :
ଭାରତୀୟ, ୧୯୫୯

ଅପ୍ପଦ : ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚାକୀ
ବର୍ଗଲିପି : ପ୍ରବୀର ମେନ
ଛବି : ଆଶିଷ ଚୌଧୁରୀ

সূচিপত্র

চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা

৯

হরিপদ কেরানির কাঁটা

৮৩

চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কাঁটা

এক

কাঁটায়-কাঁটায় সন্ধ্যা ছয়টার সময় ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়ায় কটক-স্টেশনের সামনে।

নেমে এল একক যাত্রী। বছর পাঁচিশের একজন সুবেশি যুবক। পরনে গ্রে-রঙের সফরি-সুট। গলায় নীলচে রঙের স্ট্রাইপ্‌ড-টাই, হাতে রেঞ্জিনের ফোলিও ব্যাগ। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতেই গাড়ির পিছনের ডিকিটা খুলে ওর স্যুটকেসটা রাস্তায় নামিয়ে ফেলেছে রেলওয়ে-পোর্টার। যুবকটি গাড়ির পিছনের দিকে এগিয়ে আসার অবকাশে কুলিটা মাথায় জড়িয়ে নিয়েছে তার লাল-শালুর ফেটি। প্রশ্ন করে, কৌন ট্রেনসে যানা হয়, সা'ব?

—ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস।

—বহু তো আনাবালী হয়। আজ বিল্কুল টাইম পর আ-রহী! সামান উঠায়ু?

—পুছনেকী কেয়া জরুরং হয়?

স্যুটকেসটা মাথার উপর তুলবার উপক্রম করে লোকটা বলে—বিশ রোপেয়া লাগেগা সা'ব।

পটুনাযক খপ্ করে তার মণিবন্ধটা চেপে ধরে বলল, ব্যস! মৎ উঠাও!

কুলিটা নজর করেছে, স্যুটকেসের তলায় চাকা লাগানো আছে। অর্থাৎ সাহেব ইচ্ছে করলে সেটা টেনে টেনেও নিয়ে যেতে পারেন। খদ্দের ফস্কে যাবার আশঙ্কায় কুণ্ঠিত হয়ে বলে, ক্যেউ সা'ব? ক্যা কসুর ভৈল? জাদা বোলা হয় ম্যয়নে কেয়া? কসুর হয় কুছ?

—কসুর তো জরুর হয়, লেকিন জাদা নহী, কমি। শুনো ভাই। ম্যয়নে কিসী কুলী কো তিস্-সে কম কভি নেহী দিয়া। অগর তিস্‌মে খুশি হো তো উঠাও, নহী তো ম্যায় দুসরে কুলি কো বুলাউঙ্গা।

লোকটা ঘাবড়ে যায়। এ আবার কী জাতের দরাদরি?

—ক্যা? ত্রিশ রোপেয়া মে মাল উঠানা হয়?

হাঁ-না কিছুই বলে না লোকটা। স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে স্টেশন পানে হাঁটা ধরে।

পিছন থেকে নির্দেশ ভেসে আসে—ফাস্ট-ক্লাস, ‘সি’ কুপে!

ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস আজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে আসছে। অ্যারাইভাল টাইম : ছয়টা পনের। ঠিক সেই সময়েই গজরাতে গজরাতে প্রবেশ করল ট্রেনটা। তাড়াছড়ার কিছু নেই। দশ মিনিট স্টপেজ। মালপত্র নিয়ে উঠল গাড়িতে। কুপটা ফাঁকা। এতটা সৌভাগ্য হবে আশা করেনি জগদ্বন্ধু। সচরাচর যুগলযাত্রী হলেই কুপেতে ঠাই মেলে। ও একক যাত্রী, তবু কী জানি কেন এখানেই নির্দিষ্ট হয়েছে তার আসন। তুঙ্গে বৃহস্পতি থাকলে যা হয় আর কি। ট্রেনটা যাবে সেকেন্দ্রাবাদতক্। ওর গন্তব্য অবিশ্যি বিশাখাপল্লনম্। এই ট্রেনে। সেখান থেকে ভেসে পড়বে নীল দরিয়ায়। ভাসতে ভাসতে পরবর্তী বন্দরে। সেটা ওডেসা, না পানামা, দুবাই না সিডনি জানা নেই। জানা যাবে, বিশাখাপল্লনমে রিপোর্ট করলে।

বার্থ-সংলগ্ন ছকে কাঁধের ব্যাগটা কুলি টাঙিয়ে রাখল। জগদ্বন্ধু তার হাতে-ধরা ম্যাগাজিনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখল সিটের উপর। তারপর হাত লাগালো কুলির মাথা থেকে স্যুটকেসটা নামাতে। কুলিটা চাইছিল সেটা সিটের নিচে ঠেলে দিতে। জগদ্বন্ধু বারণ করল : রাহুনে দো!

হয়তো পরবর্তী স্টেশনেই উঠবে দ্বিতীয় যাত্রী। মহিলা হবে না নিশ্চয়, তবু তার উপস্থিতিতে ও নৈশ পোশাকটা পরতে চায় না। ট্রেন ছাড়লেই ও রাতের পোশাক পরে নেবে।

কুলিটা পাগড়ি দিয়ে মুখটা মুছে হাত পাতল। জগদ্বন্ধু ওয়ালেট বার করে দু-খানা দশ টাকার নোট ওর প্রসারিত হাতে ধরিয়ে দিল। লোকটা নিক্কথায় সেলাম বাজিয়ে প্রস্থানোদ্যত হতেই পিছন থেকে ধমকে উঠল জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক : —এই...এই...কাঁহা ভাগতে হো তোম্? বাকি রূপেয়া?

লোকটা বেশ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, সা’ব! ম্যানে পহিলেই তো বোলা থা কি বিশ রূপেয়া...

—ঠিক হয়! লেकिन ম্যানে ক্যা বাতায় থা? বোলা থা না কি ম্যানে তিস সে কম কিসি কুলিকে কভি নেহি দিয়া? বোলো, সচমুহ!

কুলিটা কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

জগদ্বন্ধু ওর হাতটা টেনে নিয়ে গুঁজে দেয় আরও একটা দশটাকার নোট! বলে, অব যা সেক্তে হো...

কুলিটা হেসে ফেলে। সক্রতজ্ঞচিন্তে বলে, সা—ব...

—নেহী নেহী! ঔর নেই! যাও ভাগো!

লম্বা সেলাম করে হাসতে হাসতেই বিদায় নেয় লোকটা। সে তো জানে

না—জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক এখন খুশিয়াল মুড়ে যাচ্ছে তার চাকরিতে জয়েন করতে। কাল সকালেই সে হাতে পেয়েছে প্রমোশন অর্ডারটা। কুরিয়ার সার্ভিসে।

এবার কামরার ভিতরটা নজর করল। জানলার কাচ ও শাটার বন্ধ থাকায় ঘরটা একটু গুমোট। শীতকাল বলে ফ্যানটাও চলছিল না। জগদ্বন্ধু জানলার কাচ ও শাটার তুলে দিল। খোলা জানলার ধার ঘেঁষে বসে পড়ে। বাইরের দিকে নজর দেয়। নানান জাতের যাত্রীর আনাগোনা ওদিকে প্ল্যাটফর্মে।

পেশায় মেরিন এঞ্জিনিয়ার জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক। দু-মাসের ছুটি কাটিয়ে আজ আবার চলেছে কাজে যোগ দিতে। বয়স পঁচিশ, অকৃতদার। যাকে বলে, এলিজেবল্‌ ব্যাচিলার। মা জানতে চেয়েছিলেন, তুই বারণ করছিস্ কেন? বিদেশে তোর কি কোনো মেয়েকে পছন্দ হয়েছে?

জগদ্বন্ধু বলেছিল, মা, আমি তো বিদেশে কোথাও দু-দশ দিনের বেশি থাকি না! জাহাজে-জাহাজেই কেটে যায় মাসের পর মাস! কার সঙ্গে আলাপ হবে বলো? তবে ব্যস্ত হয়ে না, যখন বিয়ে করতে চাইব তখন জানাব। তুমিই পছন্দ করে নিয়ে এস তোমার বহরানী!

একটা গন্ধ প্রবেশ করল পট্টনায়কের নাকে। মিষ্টি অথচ ঈষৎ ঝাঁঝালো। কীসের গন্ধ? একেবারে অপরিচিতও নয় গন্ধটা। ফুলের নয়। পূর্ববর্তী যাত্রীর কোনো দীর্ঘস্থায়ী ফরাসি সুবাস?

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়ল ট্রেনটা। পট্টনায়কের হাতে সোনালী ব্যান্ডে রোলেট্র ঘড়িটায় তখন ছয়টা পঁচিশ। ইস্ট-কোস্ট-এক্সপ্রেস আজ টাইম-টেবল্‌-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের সীমানা ছাড়িয়ে ট্রেন তখন নির্দিষ্ট পথে দৌড় শুরু কবেছে। আবার গন্ধটা এসে নাকে লাগল। এবার কিন্তু ওর মনে পড়ে যায়। ক্রোরোফর্ম! গতবার সমুদ্রযাত্রায় তাকে দু-তিনদিন সিক্‌ বেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তখন একবার ওকে ও. টি. তেও যেতে হয়, পরীক্ষা করতে। সেখানেই ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল। কিন্তু এখানে ও গন্ধটা আসছে কোথা থেকে? বসা অবস্থাতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ল না। হাত বাড়িয়ে ফ্যানটা খুলে দিল। হোক শীতকাল। গন্ধটাকে এ ঘর থেকে তাড়াতে হবে।

আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। শীতের সন্ধ্যা। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। একঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল দিগন্তের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। ট্যা—ট্যা—ট্যা—

হঠাৎ খেয়াল হল, পরের স্টেশন ভুবনেশ্বর খুব বেশি দূরে নয়। সেখানে হয়তো

ওর এই একাধিপত্য ব্যাহত হবে। ওর নিজের আপার-বার্থ, হয়তো নিচের তলার মানুষ এসে উপস্থিত হবেন। সুতরাং এখনই নৈশ-পোশাকটা পরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। স্যুটকেসটা খুলে পাজামা-পাঞ্জাবি, তোয়ালে আর খবরের কাগজে মোড়া চপ্পল বার করে নিল। স্যুটকেসটা বন্ধ করে এবার সিটের নিচে পাচার করতে চাইল।

কিন্তু কি জানি কেন স্যুটকেসটা অন্দরমহলে যেতে আপত্তি জানালো। সেটা যেন কিছুতে বাধা পাচ্ছে। পূর্ববর্তী যাত্রী কি একটা মাল নামাতে ভুলে গেল নাকি? স্যুটকেসটা সরিয়ে সিটের নিচেটা এবার দেখবার চেষ্টা করল জগদ্বন্ধু। বাইরেটায় এতক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। নিচু হয়ে মনে হল সিটের নিচে কালো কাপড়ে ঢাকা বেশ বড়-সড় একটা বস্তু রয়েছে; কিন্তু একী? সেই বস্তু থেকে চুইয়ে কী যেন একটা তরল পদার্থ—রক্ত না কি?

হাত বাড়িয়ে ছেলে দিল ফ্লুরেসেন্ট বাতিটা।

এ কী! ইঁয়া, রক্তই তো!

নিচু হয়ে কালো কাপড়টা সরাতেই...

ফার্স্টক্লাস-সি কুপেতে পরমুহূর্তেই শোনা গেল একটা আত্ননাদ। যেন সেটা সবার আগে কর্ণগোচর হয়েছে রেলওয়ে এঞ্জিনটার। সেও ভয়াব্র্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়ে উঠল পর-পর তিনটি হুইসিল-এ। উপায় নেই। তাকে থেমে পড়তে হল ভ্যাকুয়াম-ব্রেকের অমোঘ নির্দেশে। কোনো একটা কামরায কেউ অ্যালার্ম-চেনটা টেনে দিয়েছে। ভুবনেশ্বর রেল-স্টেশনের ডিসট্যান্ট-সিগন্যালের সবুজ বাতির আমন্ত্রণ সত্ত্বেও এঞ্জিনটাকে গজরাতে-গজরাতে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোট্টা, টাইম-টেবল্ অনুসারী ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেসটার লেট হওয়ার পালা শুরু হল।

দুই

দু-দিন পরের কথা। একত্রিশে ডিসেম্বর। শুক্রবার, উনিশ শ' নিরানব্বই। অর্থাৎ সহস্রাব্দির শেষ সূর্যোদয় হয়েছে ঘণ্টা-খানেক আগে।

নিউ-আলিপুরে ব্যারিস্টার পি. কে. বাসুর 'ডাইনিং হল'। সকাল এখন সাতটা। পি. কে. বাসুর সঙ্গে যদি আপনাদের জান-পহ্চান না থাকে তাহলে আমি নাচার। তবু সেইসব ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী—যাঁরা 'বাসু-সিরিজ'-এর কন্টকে বিদীর্ণ হননি—তাঁদের খাতিরে ওঁর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে রাখি :

প্রসন্নকুমার বাস কলকাতা 'বার'-এর প্রবীণতম আইনজীবী। ব্যবহারিক পরিচয়ে

তিনি ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার। কিন্তু শুধু আদালত চৌহদ্দিতেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন না। অর্থাৎ অভিযুক্তকে খালাস করানোই যেন তাঁর মূল উদ্দেশ্য নয়; ওই সঙ্গে আসল অপরাধীকে চিহ্নিত না করা পর্যন্ত যেন তাঁর মুক্তি নেই। আগে নিজেই প্রচুর ছুটোছুটি করতেন। এখন তাঁর বয়েস হয়েছে : আশি ছুঁই-ছুঁই। স্বামী-স্ত্রীর ছোট পরিবার ; কিন্তু সুখী পরিবার বলতে পারি না। একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে ওঁদের একমাত্র কন্যাটির মৃত্যু হয়েছে। সে গাড়িতে মিসেস রানু বসুও ছিলেন। তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন, কিন্তু হুইলচেয়ার-নির্ভর প্রতিবন্ধীর জীবনে। অর্থের প্রয়োজন ছিল না। বাসু-সাহেব তাই প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। রানু দেবীই রাজি হননি। জোর করে আবার তাঁকে গাউন পরালেন। আবার যাতায়াত শুরু হল আদালত-পাড়ায়।

এই সময়ে ওঁদের সংসারে এসে যোগদান করল একটি সদ্যোবিবাহিত দম্পতি : কৌশিক ও সুজাতা মিত্র। একই বাড়িতে ওঁরা থাকেন। একটি গোয়েন্দা-সংস্থা খুলে বসেছিল ওরা স্বামীস্ত্রী : ‘সুকৌশলী’। গিমির ‘সু’ আর কর্তার ‘কৌ’। বাকি ‘শলী’টা পাদপুরণার্থে ‘খলু’। নামকরণটা করেছেন বাসু-সাহেবই। ওঁদের আবির্ভাবে তাঁর দৌড়ঝাপটা কমেছে।

বাসু-সাহেবের জীবন ‘কাঁটায়-কাঁটায়’ বিজড়িত। উভয় অর্থেই। সমস্যার কাঁটা এবং ঘড়ির কাঁটা। সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ফিরে আসেন পৌনে সাতটায়। না, ‘পৌনে-সাত’ মানে ‘সাতটা বাজতে মিনিট পনের নয়; আই. এস. টি : ছয়টা পঁয়তাল্লিশ। শীতকালে। গ্রীষ্মে সময়টা একঘণ্টা এগিয়ে যায়।

সাড়ে ছয়টা নাগাদ প্রাতরাশপ্রত্যাশী কৌশিক এসে বসল ‘ডাইনিং-হল’-এ আর কেউ তখনো আসেনি। তার আগেই ওঁদের বাড়ির কাজের লোক, বিশু খান দু-তিন দৈনিক পত্রিকা উঠিয়ে নিয়ে এসেছে সদর থেকে। কৌশিক খুলে বসেছে একটা পত্রিকা।

আজ কাগজের প্রথম পাতাতেই বেশ বড় করে ছাপা হয়েছে একটি হত্যাপরাদ। হেডলাইন নিউজ নয়, তবে প্রথম পৃষ্ঠার ডানদিকে বেশ বড় হরফে ছাপা। গত পরশু রাত্রির ঘটনা। গত কালকের কাগজে মুদ্রণের সময় পাওয়া যায়নি। মনে হয় খবরটা অনেক রাত্রে আসায় আজ সবিস্তারে তা প্রকাশিত হয়েছে। ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেসের ফার্স্টক্লাস কামরায় আবিষ্কৃত হয়েছে একটি মৃতদেহ।

এ জাতীয় সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়ার কথা নয়। পথে-ঘাটে আজকাল সকাল-সন্ধ্যা মৃতদেহ আবিষ্কৃত হচ্ছে। পার্টি-মস্তানদের ক্রমাগত : ‘খুনকা বদলা খুন’। এটা তা নয়। প্রথমত মৃতদেহটা একজন সুন্দরী মহিলার, দ্বিতীয় কথা সেটা পাওয়া

গেছে ওই ট্রেনের ফাস্ট ক্লাস 'কুপের' কুপে এবং সর্বোপরি মেয়েটি একজন ধনকুবেরের একমাত্র কন্যা তথা একমাত্র ওয়ারিশ!

সাংবাদিকের আন্দাজে মহিলাটির বয়স ত্রিশ। অত্যন্ত ফর্সা, সুন্দরী এবং সুসজ্জিতা। তাঁর বুকের উপত্যকায় সম্ভবত বিদ্ধ হয়েছিল একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা—আমূল। ছুরিটা পাওয়া যায়নি। মহিলার ভ্যানিটি ব্যাগটা কিন্তু সিটের নিচে পাওয়া গেছে। তাতে ছিল সামান্য কিছু টাকা, দশ হাজার টাকার ট্রাভেলার্স-চেক, প্রসাধন-সামগ্রী, রেলওয়ে টিকিট আর ক্যালকাটা-ক্লাবের সদস্য-কার্ড। শেষোক্ত কার্ড থেকেই জানা গেছে তাঁর পরিচয়। নাম : কমলকলি মালহোত্রা। স্বামীর নাম রূপেশ। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর পিতা হচ্ছেন স্বনামধন্য ধনকুবের : জগৎপতি দস্তুর।

শেষোক্ত হেতুতেই সংবাদটা প্রথম পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা জুড়েই স্ফুটন হয়নি উপচে পড়েছে পঞ্চম পৃষ্ঠাতে। পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা বেশ মুম্বিয়ানার সঙ্গে সংবাদটা পরিবেশন করেছেন। মৃতদেহটি প্রথম আবিষ্কার করেন একজন তরুণ মেরিন এঞ্জিনিয়ার। তিনি কটক থেকে বিশাখপত্তনম যাচ্ছিলেন। সেই 'সি'-চিহ্নিত কুপেতে যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন সেটা ফাঁকাই ছিল। কিন্তু ট্রেনটা ছাড়ার পরে তাঁর নাকে একটা ক্লোরোফর্মের গন্ধ ভেসে আসে। চলন্ত ট্রেনে সেটা অপ্রত্যাশিত। পরক্ষণেই তাঁর নজরে পড়ে নিচে একটা রক্তের ধারা। নিচু হয়ে তিনি দেখতে যান—সিটের নিচে কী আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি চেন টেনে দেন। ভুবনেশ্বর স্টেশনের অনতিদূরে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে মহিলার স্বামী রূপেশ মালহোত্রা তাঁর নিজস্ব গাড়িতে ভুবনেশ্বর চলে যান। তিনিই মৃতদেহ শনাক্ত করেন। তিনি জানাতে চাননি বা জানেন না, মিসেস মালহোত্রা কোথায় যাচ্ছিলেন বা তাঁর কোনো পুরুষসঙ্গী ছিল কি না। তবে বেলওয়ে পুলিশের সরবরাহ-করা তথ্য অনুসারে সেই সি-কুপেতে যাচ্ছিলেন স-কন্যা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পদ্মশ্রী জগৎপতি দস্তুর। মৃতের ভ্যানিটি ব্যাগে তাঁর টিকিটও ছিল। কন্যা খুন হয়ে যাবার সময় তিনি কোথায় ছিলেন জানা যায় না। রেলওয়ে চেকার জানিয়েছেন তিনি তখনো ওই কামরায় টিকিট চেক করতে যাননি। মহিলার সঙ্গে ওই ভ্যানিটি-ব্যাগ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মালপত্র ছিল না। সংবাদপত্রের তরফ থেকে জগৎপতি দস্তুরকে তাঁর কলকাতার লাউডন-স্ট্রিটের বাড়িতে ফোন করা হলে তিনি জানান যে, কন্যার মৃত্যুসংবাদ তিনি ইতিপূর্বে জেনেছেন ; তাঁর জামাই ভুবনেশ্বরে চলে গেছেন, তিনি নিজে ওই ট্রেনে আদৌ যাননি।

ইতিমধ্যে সুজাতা এসে বসেছে। সে আর একটি সংবাদপত্র তুলে নিয়ে ওই

মর্মান্তিক হত্যাসংবাদটিই পড়ছিল। বললে, ব্যাপারটা অত্যন্ত মিস্টিরিয়াস, তাই নয়? ‘স্বামী-স্ত্রী’ যুগলে গেলেই সচরাচর কুপেতে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। কোনো একক মহিলাকে কুপেতে এভাবে একা যেতে দেওয়া হয় না। অথচ রূপেশ মালহোত্রা কলকাতায় ছিলেন। তিনি জানেন না, তাঁর স্ত্রী কার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিলেন! এটা বিশ্বাস্য?

কৌশিক বলে, অফকোর্স! ‘এস্তাই তো হোন্দাই রহতা’—এমনটা তো হয়েই থাকে। আমি সঙ্গে না থাকলে তুমি কি-একা-একা কোন পুরুষ-সঙ্গীর সঙ্গে কোথাও যেতে পার না? বা জীবনে কখনো যাওনি?

—না! কুপেতে নয়!

—কিন্তু কুপেতে রাত্রিবাসের কোনো পরিকল্পনা তো ওদের ছিল না। থাকলে ওই মেরিন এঞ্জিনিয়ার কটক থেকে সন্ধ্যারাত্রিতে ওই কুপেতে রিজার্ভেশন পেতেন না। মিসেস মালহোত্রার গন্তব্যস্থল ছিল নিশ্চয় কটকের আঙুরের কোনো স্টেশন। তাছাড়া ‘পুরুষ’ কোনো সহযাত্রী যে ছিলই এমন কোনো এভিডেন্স এখনো তো আবিষ্কৃত হয়নি।

এই সময়েই বাসু-সাহেব ফিরে এলেন প্রাতর্ভ্রমণ সমাপ্ত করে। ওভারকোটটা খুলে এসে বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে। বললেন, ‘কী লয়ে বিচার? শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই-চার।’ ও বুঝেছি! কমলকলি হত্যারহস্য। কাগজটা খুঁটিয়ে পড়েছ?

কৌশিক বলে, আপনি জানলেন কী করে? আপনি যখন বেড়াতে যান, তখনো তো সকালের কাগজ আসেনি?

ইতিমধ্যে চা-কফির সরঞ্জাম নিয়ে ফুটকি আর বিশু এসে উপস্থিত। ফুটকি হচ্ছে বিশুর সম্পর্কে দিদি। সে সম্প্রতি বহাল হয়েছে মিসেস বাসুর কম্পানিয়ান হিসাবে। তাছাড়া সুকৌশলী দম্পতির সদ্যোজাত কন্যার তদারকি করতে। রানীদেবীও তাঁর হুইল চেয়ারে পাক মেরে এসে উপস্থিত হলেন ভিতর বাড়ি থেকে।

বাসু কৌশিকের প্রশ্নের জবাবে বললেন, শুধু সংবাদপত্র-নির্ভর গোয়েন্দাগিরি শার্লক-হোমসের আমলে চলত মিস্টার অ্যান্ড মিসেস সুকৌশলী। এখন প্রচার মিডিয়া অনেক-অনেক অ্যাডভান্সড। তোমরা বোধহয় কাল অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলে—সাক্ষ্য টি. ভি. নিউজ শুনবার সময় পাওনি।

রানু একটু পরে এসেছেন। তাই আলোচনার ধরতাইটা ধরতে পারেননি ঠিক। বললেন, কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? কমলকলি হত্যারহস্য?

বাসু বলেন, ওই দেখ! তোমাদের মামীও খবরটার বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

কৌশিক জানতে চায়, এটা কি আইনত রেলওয়ে পুলিশের এজিয়ারে, না এক বৃদ্ধে দুটি কাঁটা—2

উড়িষ্যা পুলিশ-ফোর্সের ?

বাসু বলেন, আইন-টাইন আমি ভাল বুঝি না বাপু। তবে আমার আন্দাজ : এটা বর্তমানে তোমার-আমার এক্তিয়ারে।

—আপনার-আমার ? কোন সূত্রে ?

বাসু নিঃশব্দে তাঁর পকেট থেকে একটি খাম বার করে ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এটা কাল সন্ধ্যায় স্পেশাল মেসেঞ্জারে এসেছে। পড়ে দে'খ...

খামটা বেশ ভারী, দামী ওজনদার কাগজের জন্য। বাঁ-দিকের নিচে কায়দা করে মনোগ্রাম করা ইংরেজি বড় হরফে দুটি অক্ষরের জড়াজড়ি : 'জে. ডি'। মাঝখানে কালো কালিতে—টাইপকরা নয়—বাসু-সাহেবের নাম ঠিকানা। প্রেরকের ঠিকানা খামের উপর নেই। ভিতরের চিঠিখানা কৌশিক খুলে বার করল। এটাও ইম্পোর্টেড দামী লেটার-হেডের কাগজ। উপরে ছাপা অক্ষরে লেখা : 'জগৎপতি দস্তুর'। ব্যস, আর কিছু না—না ঠিকানা, না কোন ফ্যাক্স-মোবাইল নম্বর—কিছু নেই। এই চিঠিখানিও টাইপ-করা নয়। জগৎপতির টানা হস্তাক্ষরে মোটা-মোটা ইংরেজিতে লেখা। বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় :

প্রিয় মিস্টার বাসু,

মিডিয়া-মাধ্যমে ইতিমধ্যে আমার দুর্ভাগ্যের কথা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন। সাহায্যের প্রয়োজন। কাল, সকাল নয়টার সময় একবার অধমের গরিবখানায় পদার্পণ করলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ধন্যবাদান্তে ইতি

ভবদীয়

জগৎপতি দস্তুর।

কৌশিক চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললে, বুঝলাম। তা আপনার এক্তিয়ারটা বোঝা গেল, কিন্তু রহস্যের সঙ্গে 'সুকৌশলী'র কী সম্পর্ক তা তো বোঝা যাচ্ছে না।

বাসু-সাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে গৃহিণীর দিকে ফিরে বললেন, রানু, 'অভিমান' শব্দটার ইংরেজি কী গো ?

রানু কর্তা-বাদে প্রত্যেকের প্লেটে কাঁটা-চামচ আর ডিম টোস্ট সাজাতে সাজাতেই জবাব দেন—ও শব্দটার 'ইংরেজি' হয় না। যেমন বাঙলা হয় না সুজাতার মুখের বর্তমান অভিব্যক্তি। কর্তার কথায় she has blushed !

সত্যি কথা ! সুজাতার মতে 'সুকৌশলী' ব্যারিস্টার বাসুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

গাই কৌশিকের প্রশ্নটায় সে লজ্জা পেয়েছে।

বাসু তাঁর ফলে ভরা প্রাতরাশের ডিশটা কাছে টেনে নিয়ে বললেন ; তাহলে গ্রামিই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিই কৌশিককে। মাথার সঙ্গে কানব যে সম্পর্ক, মহাবীর কর্ণের যুগল কর্ণের সঙ্গে যুগল কুণ্ডলের যে সম্পর্ক অথবা মহাবীর শবননন্দনের সঙ্গে তাঁর লাঙ্গুলের যে সম্পর্ক !

কৌশিক হেসে ফেলে। বলে, আপনার শেষ উপমাটায় আমি কাৎ এবং মাৎ ! মামু যখন স্বয়ং হাঁকোমুখো হ্যাংলা হতে স্বীকৃত তখন আমরা কেন হতে পারব না তাঁর যুগল লাঙ্গুল ? কী বল সুজাতা ?

সুজাতা কর্তাকে ধমক দেয়, সব সময় এমন বিশ্রী রসিকতা আমার ভাল লাগে না।

রানু বলেন, এবার কিন্তু তুমি অন্যায় রাগ করছ সুজাতা। তোমাদের মামু নাকপ্রয়োগের উত্তেজনায় নিজেই হাঁকোমুখোর উপমেয় হতে স্বীকৃত হয়েছেন। যুগল ন্যাজের কল্যাণে !

বাসু ফর্ক দিয়ে চেপে ধরে পের্পের টুকরোটাকে কাটতে কাটতে বললেন, আমার ধারণা এটা ‘উপমা’ নয় আদৌ, ‘মেটাফার’। ফলে উপমান-উপমেয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রশ্নটা বদলে দেবার আগ্রহে সুজাতা বলে, আপনি কি ওই মেয়েটিকে চিনতেন, মামু ?

—কে ? কমলকলি ? হ্যাঁ, ওর বিয়েতেও নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম—যাওয়া হয়নি। দস্তুর-সাহেব আমার পুরানো ক্লায়েন্ট। ওই কমলকলি হচ্ছে জগৎপতির একমাত্র দস্তান। কম বয়সেই ওর মা মারা গেছেন। তখনো জগৎপতি যুবকই। কিন্তু সে আর বিয়ে করেনি।

রানু জানতে চাইলেন, কেন ?

—কেন, তা জানি না। তবে মা-হারা মেয়েটিকে দস্তুর দস্তুর মতো আদর দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করে। পারে না।

সুজাতা বলে, ‘পারে না’ মানে ? কী পারে না ?

—‘মানুষ’ হিসাবে গড়ে তুলতে। টোটালি স্পয়েন্ড চাইন্ড ! তবে সুখের কথা, ড্রাগ্‌স্ বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের শিকার হয়ে পড়েনি। সোসাইটিতে মক্ষিরানীর ভূমিকাটাতেই তার সম্ভ্রুতি। একাধিক তরুণ জীবকের স্ত্রুতিতেই তার তৃপ্তি। ক্রমাগত সে বয়-ফ্রেন্ড পরিবর্তন করে ডেটিং করত। দস্তুরের এক কাজিনপুত্র একটা মার্ভার কেসে ফেঁসে যাওয়ায় আমি ওদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। সেটা প্রায়

বছর তিন-চার আগেকার কথা। ওই সময়ে কমলকলি একটি ক্লাস-ওয়ান লম্পটের প্রেমে পড়ে—যাকে বলে ‘হেড ওটার হীলস্’। কী যেন নাম ছোকরার—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কুমার বিক্রমজিৎ সিং। নিজের পরিচয় দিতে সে নাকি বলত যে, সে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের কোন ভূতপূর্ব রাজপরিবারের সন্তান। সে আমলে ছেলেটিকে দেখেছিলাম। এন্সিডিংলি হ্যান্ডসম, স্মার্ট, টল। বলিউডে কেন যায়নি জানি না। তবে কানাঘুয়ায় শুনেছিলাম একটু ‘শেডী’ ক্যারাকটার। ব্যবসা করে, তবে কিসের বিজনেস্ কেউ জানে না। মাঝে মাঝেই মধ্যপ্রাচ্যের নানান জায়গায় উড়ে যায়—দুবাই, বেরুট, ওমান, কুয়েৎ। এদিকে মুম্বাই, হংকং, সিঙ্গাপুর! কলকাতায় এসে আশ্রয় নেয় খানদানী হোটেলে। তাজবেঙ্গল বা কেনিলওয়ার্থে। বিজনেস্টা কীসের জানা নেই, তবে অর্থগমটা যে ভালই, তা আন্দাজ করা যায়। এ ছাড়া আর যা করে তা হল বড়লোকের সুন্দরী মেয়ে বা বউয়ের সঙ্গে প্রেম। কমলকলির মতো অস্থিরমতি মেয়েকে সে আকর্ষণ করতেই পারে, কিন্তু এ ধরনের লোক যে মিস্ দস্তরের মতো শিক্ষিতা বুদ্ধিমতীর মাথা, ঘুরিয়ে দেবে এটা আশঙ্কা করা যায়নি। ছোকরা কিন্তু তাই দিয়েছিল। তবে জগৎপতিও পাকা খেলোয়াড়। দক্ষ হাতে সে ইন্টারফিয়ার করে। আমার যতদূর আন্দাজ, সে সি. বি. আইয়ের কোন বড়কর্তাকে দিয়ে বিক্রমজিৎকে কড়কে দেয়। মিস্ দস্তরের পিছনে ঘুরঘুর করলে তার ব্যবসার হাল-হকিকৎ নিয়ে টানা-পোড়েন শুরু হবে। তৎক্ষণাৎ বিক্রমজিৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে হাওয়া। তারপর দস্তর খুব তাড়াহুড়া করে রূপেশ মালহোত্রার সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দেয়। দিল্লীতে। কলকাতাতেও একটা পার্টি থো করেছিল। তাজবেঙ্গলে। কিন্তু আমার যাওয়া হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, তখন আমি চুঁচুড়ার সেই সাইকিয়াট্রিস্ট ডক্টর ঘোষালের মার্ভার কেসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

—সেই ‘ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটা’?

—হ্যাঁ, কৌশিক ওই রকমই কী একটা নামকরণ করেছিল মনে হচ্ছে।

রানী প্রশ্ন করেন, রূপেশ মালহোত্রার ব্যাকগ্রাউন্ড কী?

বাসু বলেন, আমি জানি না। রূপেশ ছোকরা দস্তরের জামাই হবার আগেই আমার সেই কেসটার ফয়সালা হয়ে যায়।

কৌশিক বলে, আমি কিন্তু তাকে ঘটনাচক্রে চিনি, মামু।

—কী রকম?

—একজন পসার-ওয়াল অ্যাডভোকেটের একমাত্র মেয়ের সম্ভাব্য পাত্র ‘রেসুড়ে’ কি না সম্বন্ধে নিতে আমাকে একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল। গতবছর। কলকাতার রেস-কোর্সে। সেখানেই আমার

এক সহকারী চিনিয়ে দেয় রূপেশকে। ধনকুবের দস্তুর সাহেবের জামাইয়ের পরিচয়ে। তার মুখেই শুনেছিলাম, সিনিয়ার মালহোত্রা বেশ মালদার লোক ছিলেন। দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে কী যেন ব্যবসায়িক-সূত্রে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও ছিল। রূপেশ ছেলেটি সুদর্শন, দীর্ঘকায়। গ্র্যাজুয়েট। বাপের ব্যবসা দেখত। ওর বিয়ের পরই সিনিয়ার মালহোত্রা প্রয়াত হলেন। বাপের সম্পত্তি সবকিছুই বর্তায় তাঁর একমাত্র পুত্রের হাতে। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে সে তার বেশিরভাগই উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে। ওই ঘোড়ার খুরে খুরে। কয়েকটি চালু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ঘোড়া নয়, মদ্যপানে এবং আরও কিছু ‘ম’-কারাস্ত ব্যাধিতে। পরে শুনেছি, ব্যবসাপত্র সবই লাটে উঠেছে। এখন শ্বশুরের সম্পত্তিই তার একমাত্র ভরসা! কারণ ব্যাঙ্কও নাকি ওকে কর্জ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রচুর দেনায় আকষ্ট ডুবে সে শুধু প্রতীক্ষা করছে কবে পূজ্যপাদ শ্বশুরমশাই সাধনোচিতধামে প্রয়াণ করেন।

বাসু বললেন, পশ্চাৎপটটি পরিষ্কার বোঝা গেল।

ইতিমধ্যে সকলের প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল।

রানু বললেন, মেয়েটির কপালটাই খারাপ! জন্মেছে রাজকন্যা হয়ে। বিয়ে হল এক মন্দো-মাতালের সঙ্গে। তার উপর রেসুড়ে।

বাসু বললেন, দোষ কি তার কপালেরই শুধু? পুরুষকারের নয়?

কৌশিক বলল, ‘পুরুষকার’?

—ওই হল রে বাপু! ‘নিয়তির’ বিপরীতার্থক স্ত্রীলিঙ্গে কী হবে আমি জানি না। ‘নারীবীর্য’ হবে কি? ‘উইমেন্স লিব’-এ ধ্বজাধারীরা কী বলেন? শব্দটা ব্যাকরণ সম্মত?

রানু বলেন, বৈয়াকরণিক কী বলবেন জানি না। প্রাণীবিজ্ঞানসম্মত নয়। তবে তোমার বক্তব্য আমরা বুঝেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। কমলকলি ডুবেছে স্বখাতসলিলে। ঈশ্বর তাকে একটা প্রকাণ্ড হ্যান্ডিকাপ দিয়ে দুনিয়াদারী করতে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের দোষেই সে বেঘোরে প্রাণটা দিল।

কৌশিক বলে, শুনেছিলাম ওদের দুজনের মধ্যে নাকি মিউচুয়াল ডিভোর্স হতে চলেছিল। রূপেশ কাগজে সই করতে রাজি যদি শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে একটা অত্যন্ত মোটা অঙ্কের খেশারত পায়।

সুজাতা বলে, অর্থাৎ ‘নাকের বদলে সোনার নরুন’! রাজকন্যার বদলে অর্ধেক রাজত্ব!

রানু প্রশ্ন করেন, কমলকলির নামে যেসব সম্পত্তি ছিল, তার ওয়ারিশ তো এখন রূপেশ? যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি।

বাসু বলেন, যদি না কমলকলি উইল করে সব সম্পত্তি অন্য কাউকে দিয়ে গিয়ে থাকে।

প্রাতরাশ শেষ হয়েছিল। বাসু জানতে চান, কৌশিক কি তাহলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ দস্তুরের ‘গরিবখানায়!’ না কি একাই যেতে হবে আমাকে?

কৌশিক জবাব দেবার আগে রানু বলে ওঠেন, তোমার যুগল লাস্কুলই সঙ্গে যাচ্ছে।

—যুগল-লাস্কুল?

—সরি। আই মীন দুটো কানই। মাথার টানে কান। কৌশিক আর সুজাতা। সুজাতা বলে, কিন্তু মিঠু?

—সে থাকবে তার দিদার কাছে! চিন্তা কী?

তিন

নিউ আলিপুর থেকে লাউডন স্ট্রিটের ‘দস্তুর-প্যালেস’ পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। অফিসযাত্রীদের ভিড় সবে শুরু হয়েছে। জমকালো কাস্ট-আয়রনের গেট থেকে পোর্টিকো পর্যন্ত লাল মুরাম-বিছানো পথ। পদচারীদের কিছু অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ হাইহিল-খারিণীদের। কিন্তু এ পথে পদাতিকের আবির্ভাব সেই যাকে বলে—‘নীলচন্দ্রিমার জমাকায় বারেক!’ ওঁদের ফিয়াট গাড়িটা পোর্টিকোর আচ্ছাদনে এসে থামতেই ছুটে এল খাকি উর্দিপরা দারোয়ান। সেলাম করে খুলে দিল গাড়ির দরজা। ওঁরা তিনজন নামতে কৌশিকের হাত থেকে গাড়ির চাবিটা চেয়ে নিল। গাড়ি ঠিক মতো পার্ক করে সে চাবি নিয়ে ওখানে প্রতীক্ষা করবে। ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন ঝকঝক সাফারি সুট-পরা এক সুদর্শন ভদ্রলোক। সম্ভবত দস্তুর-সাহেবের সেক্রেটারি। কৌশিক পরে জানতে পারে, সে দস্তুর-সাহেবের দস্তুরমতো খাশ বেয়ারা! ওঁদের তিনজনকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বিশাল ড্রাইংরুমে। সেখানে তখন সুরেলা স্বরে একটি চাইমিং ক্লক সকাল নয়টার সঙ্কেত দিচ্ছে।

হাতঘড়ির সবচেয়ে বড় কাঁটাটা পুরো একচক্রর মারার আগেই সে ঘরে প্রবেশ করলেন জগৎপতি দস্তুর। ছয় ফুটের উপর দীর্ঘ, সুঠাম চেহারা। গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা, একটু বুঝিবা গোলাপি আমেজ। ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো পাতলা হয়ে আসা চুলের স্কোর বোর্ডে সাদা চকখড়ি দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাটসম্যানের হাফসেঞ্চুরি হয়ে গেছে। পরিধানে চাইনিজ সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে চামড়ার বিদ্যাসাগরী চটি, চোখে রিমলেস সোনার চশমা, দশ আঙুলে গ্রহবারণ ছয়টি আঙুটি।

কে বলবে—ওঁর একমাত্র কন্যাটির মর্মান্তিক মৃত্যুর পর তিনটি সূর্যাস্তও হয়নি।
লৌহকঠিন ব্যক্তিত্ব!

আগন্তুকদের বিপরীতে একটি সোফায় আসন গ্রহণ করে তিনি বিনা ভূমিকাতেই শুরু করলেন, মিস্টার বাসু, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, কেন এভাবে আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি। আঘাত আমি সহিতে পারি, কিন্তু অপমান নয়। আমার কন্যার এই মর্মান্তিক পরিণতির একটা বিচার চাই। ওয়েস্ট-বেঙ্গল আর উড়িষ্যা দুটো স্টেটের পুলিশই জয়েন্টলি তাদের কর্তব্য করছে। অ্যান্ড দে আর ডুইং ইট এক্সিডিংলি ওয়েল। আ'হ্যাভ নাথিং টু কমপ্লেইন অ্যাবাউট। তবু আমি চাই, একই সঙ্গে আপনি এবং আপনার সুকৌশলী পৃথকভাবে এ তদন্তের ভার নিন। সমান্তরাল তদন্ত।

বাসু গভীরভাবে বললেন, কিন্তু কেন? আপনি কি পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না?

—ঠিক তা নয়, ব্যারিস্টার-সাহেব। আমি চাই প্রকৃত অপরাধীকে সঠিকভাবে গনাক্ত করতে এবং...ইয়েস, হি অর শী শ্যাল বি হ্যাণ্ডেড বাই দ্য নেক...ওসব ঘাবজ্জীবন টিবনে আমার তৃপ্তি হবে না সেকেন্ডলি, আমি চাই না, লোকটাকে চিহ্নিত করার পর আপনি বেমক্কা তার ডিফেন্স কাউন্সেল হয়ে পড়েন।

—আপনার ধারণা ভুল। প্রকৃত অপরাধীকে আমি কখনো...

—আই নো, আই নো, স্যার। এ নিয়ে এখন আলোচনার কোনো মানে হয় না। আপনি কি আমার লিগ্যাল কাউন্সেলার হতে স্বীকৃত।

—অস্বীকৃত হবার কোনো কারণ হয়নি। তবে কেসটা আগে বিস্তারিত শুনি। কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে প্রথমে।

—বলুন?

—প্রথম প্রশ্ন : কমলকলিকে কে খুন করেছে তা কি আপনি জানেন?

এই প্রথম একটু বিচলিত মনে হল দস্তুর-সাহেবকে। ইতস্তত করে বললেন।
সন্দেহভাজন দু'একজন যে নেই, তা বলব না...

বাধা দিয়ে বাসু-সাহেব বলে ওঠেন, সন্দেহের কথা হচ্ছে না। নিশ্চিতভাবে জানেন কি না, বলুন?

—না, জানি না। নিশ্চিতভাবে জানলে তো এতক্ষণে তাকে হাজতে পুরে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

—অল রাইট, স্যার! এবার আপনি একটু বিস্তারিতভাবে বলুন। মানে সংবাদপত্রে যা মুদ্রিত হয়নি। কমলকলি কেন ভুবনেশ্বরে যাচ্ছিল? সেখান থেকে শুরু করুন।
Better begin at the beginning !

—না, কলি ভুবনেশ্বরে যাচ্ছিল না আদৌ। যাচ্ছিল বালাসোর। ওখান থেকে তার চাঁদিপুর যাবার কথা ছিল। ইনফ্যাক্ট, আমার এক ডিসট্যান্ট কাজিন-এর ছেলে থাকে বালাসোরে। তার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির একটা পার্টি ছিল—আজই ওরা সেখান থেকে সদলবলে চাঁদিপুরে বেড়াতে যাবার প্ল্যান করেছিল। আমার জন্যও রেলওয়ে টিকেট কাটা হয়েছিল ; কিন্তু হঠাৎ একটা কাজে আমি যেতে পারলাম না। কলি—আই মিন কমলকলি একাই রওনা হল।

—একেবারে একা?

—না। ওর একজন কম্প্যানিয়ান সঙ্গে ছিল। সোমা হাজরা।

—ওই একই কম্পার্টমেন্টে? ‘সি’-কুপেতে?

—না না, সে ছিল সেকেন্ড-ক্লাসে। সেই তো ফিরে এসে প্রথম রিপোর্ট করে। তার কথা অবশ্য কাগজে কিছু বের হয়নি।

—অল রাইট। তার কাছ থেকেই তাহলে ফার্স্ট-হ্যান্ড রিপোর্ট শুনব। সে এ বাড়িতেই আছে তো?

—হ্যাঁ, তিন কুলে তার কেউ নেই, যাবে আর কোথায়? খুব ভেঙে পড়েছে। ন্যাচারালি!

—আপনি যা বলছিলেন, তাই বলে যান। আপনার যাওয়া হল না। যে কোনো কারণেই হোক। তা আপনি কি টিকিটটা রিফান্ড করেছিলেন?

—না। করিনি। দেখুন, আমরা এ. সি. টিকিট পাইনি। কিন্তু ফার্স্ট-ক্লাস কুপে পেয়েছিলাম। আমি ইচ্ছে করেই টিকিটটা ফেরত দিইনি। যাতে দিনের বেলা কুপের নির্জনতায় কলির কোনো বেগানা যাত্রাসঙ্গী না জোটে। কিন্তু সেটা যে এমন ‘ফেটাল’ হয়ে যাবে তা কেমন করে জানব?

—বটেই তো! তারপর?

—যেহেতু কলি একটা ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারিতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছিল, তাই তার সঙ্গে সামান্য কিছু গহনা-গাটিও ছিল। মানে ধরুন, তার মার্কেট প্রাইস আট-দশ লাখ টাকার মতো হবে।

—জাস্ট আ-মিনিট! সে নিশ্চয় ট্রেনে সেগুলো পরে যাচ্ছিল না। তাহলে সেগুলো ছিল কোথায়? ওর ইউজুয়াল লাগেজের মধ্যে?

—না, না। জুয়েলারি আর অর্নামেন্টস্ ছিল একটা আলাদা ছোট কেস্-এ। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝা যেত না যে, তার ভিতরে কী আছে। মনে হত কসম্যাটিগ্-প্যাক। সেটা কলির সঙ্গেই ওর ‘সি’ কুপেতে ছিল। সেটা সে হাতছাড়া করার মেয়ে নয়। তার বাকি লাগেজ ছিল ওই কম্প্যানিয়ানের সঙ্গে। সেকেন্ড ক্লাসে।

—বুঝলাম। বলে যান।

—বালাসোরে ট্রেন থামলে ওই কম্প্যানিয়ান, মানে মিস সোমা হাজরা ট্রেন থেকে নামে। একটা কুলিব মাথায় মালপত্র চাপিয়ে কলির কামরায় চলে আসে। কলি তখন তাকে বলে, সে ওই বালাসোরে নামবে না। আরো কিছুটা দূর যাবে। কেন, কী বৃত্তান্ত তা বুঝিয়ে বলেনি। সোমাকে নির্দেশ দিয়েছিল, বালাসোরের ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে। আরও বলেছিল সে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ডাউন ট্রেনে বালাসোরে ফিরে আসবে। সোমা অবাক হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। একটু বিহুল হয়ে পড়ে। তখনই ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। সোমা মালপত্র প্রথমে ক্রোকরুমে জমা দেয়। তার ছিল সেকেন্ড ক্লাস টিকিট। তাই সে ফার্স্টক্লাসের ওয়েটিং রুমে ঢুকতে পারে না। তার প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে থাকে। এরপর অনেকগুলি ডাউন ট্রেন আসে ও চলে যায়। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটায়। কলি কিন্তু ফিরে আসে না। সোমা বাধ্য হয়ে একটা রিটারারিং রুম বুক করে। ফার্স্টক্লাস লেডিজ ওয়েটিং রুমের মহিলা কর্মচারীকে বলে রাখে যে, কালো রঙের শিফন শাড়ি পরা খুব ফর্সা এক মহিলা যদি সোমা হাজরার সন্ধান করেন তাহলে তাঁকে যেন ‘বি’ নম্বর রিটারারিং রুমে খোঁজ নিতে বলে। সারা রাতের মধ্যেও কলি ফিরে আসে না। শেষ পর্যন্ত গতকাল সকালে সোমা স্টেশনের জি. আর. পুলিশ স্টেশনে একটা ডায়েরি করে। মালপত্র ক্রোকরুম থেকে খালাস করিয়ে দুপুরের কোন ডাউন ট্রেনে ফিরে আসে। সে সময় আমি অবশ্য বাড়িতে ছিলাম না। তবে ঘটনার রাত্রেই আমরা খবর পাই। কারণ কলির ব্যাগে দুটো টিকিট ছাড়াও ক্যালকাটা ক্লাবের কার্ডটা ছিল। কাল সকালেই আমার জামাই বাই রোড ভুবনেশ্বরে চলে যায়। বডি আইডেন্টিফাই করে।

বাসু জানতে চান, আপনার মেয়ে কেন বালাসোরে নামলো না তার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন?

—অ্যাপারেটলি কোন কারণ তো খুঁজে পাচ্ছি না। তবে সোমা যা বলছে তাতে মনে হয়, বালাসোরে কলি তার কুপের মধ্যে একা ছিল না।

সুজাতা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। বলে, সোমা কী বলছে, তা সরাসরি তার মুখ থেকে শুনলেই ভাল হয় না?

বাসু বললেন, সেটা তো শুনবই। কিন্তু সে ফিরে এসে মিস্টার দস্তুরকে কী বলেছিল—আই মীন কতদূর তাঁর স্মরণে আছে—সেটা প্রথম শুনে নিতে দোষ কী? আপনি বলুন, মিস্টার দস্তুর?

—সোমা কলিকে ডাকতে গিয়ে ভিতরে একজন পুরুষকে দেখে। সে কুপের ভিতর পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। উল্টো দিকের জানলা দিয়ে বাইরে কিছু দেখছিল।

সোমা তার মুখ দেখতে পায়নি।

কৌশিক জানতে চায়, সোমা কি কামরায় উঠেছিল?

—না, সে প্ল্যাটফর্ম থেকেই কথা বলছিল।

—প্ল্যাটফর্ম কি করিডোরের দিকে পড়েছিল, না কি কুপের ভিতরের দিকে?

—করিডোরের দিকে। কলি করিডোরে দাঁড়িয়ে সোমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

মুষ্টিবদ্ধ দু-হাতের উপর থুতনির ভাব রেখে, মেঝেয় পা পাতা ডুবে যাওয়া নরম গালিচার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন বাসু-সাহেব। হঠাৎ বলে বসেন, আপনার কী মনে হয়? ওই আগন্তকের অকস্মাৎ আবির্ভাবেই কমলকলি বালাসোরে না নামার সিদ্ধান্তটা হঠাৎ নিয়ে বসেছিল?

—লোকটা আন-অ্যাপয়েন্টেড অকস্মাৎ এসেছিল কি না আমি জানি না, কলি সিদ্ধান্তটা হঠাৎ নিয়েছিল কি না তাও আমি জানি না। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিই যে তার সিদ্ধান্ত বদলের হেতু এটা ধরে নেওয়ার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

—কারেক্ট। তা সেই লোকটি কে হতে পারে এ বিষয়ে আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন না?

দস্তুর প্রত্যুত্তর করার আগেই তাঁর হাতে ধরা যন্ত্রটায় একটা ‘বিপ্ বিপ্’ শব্দ হল। বোতাম টিপে উনি যন্ত্রটা কর্ণমূলে ধরে কিছু শুনলেন। যন্ত্রের কথামুখে বললেন, “থ্যাক্স্ ফর রিমাইন্ডিং মি... না জিজ্ঞেস করিনি, এখন করছি। করে তোমাকে জানাচ্ছি” তারপর ওঁদের দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের জন্য চা-কফি বা ড্রিংস কিছু পাঠাতে বলব?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করেন, কে জানতে চাইছেন? সোমা হাজরা?

—না, আমার সেক্রেটারি। ইন্ ফ্যাক্ট তিনিই আমার হাউস-কীপার। কলির মা মারা যাবার পর।

—আই সি! তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। যাবার আগে কথা বলে যাব। ওঁকে আপাতত জানিয়ে দিন, আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। আর কিছু চাই না।

যন্ত্রে সংবাদটা জানিয়ে বোতাম টেপার পর বাসু বললেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। সেটা আবার করব?

—না। মনে আছে আমার।...না, আমার কোনও নিশ্চিত ধারণা নেই।

—নিশ্চিত ধারণার কথা তো আমি জানতে চাইনি। অনুমান? এনি ওয়াইন্ড গ্যেস?

দস্তুর কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ বসে রইলেন। মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি। তারপর বললেন, সরি। আই হ্যাভ দ্য নেম আনসার। কোনকিছু অনুমান করতেও পারছি না আমি।

—আই সি! পোস্টমর্টাম রিপোর্ট এখনো...

বাসুর প্রশ্ন না শেষ হবার আগেই উনি বললেন, না। এখনো পাওয়া যায়নি। আর পেলেই বা কী জানা যাবে? মৃত্যু তো হয়েছে একটা ছোরার আঘাতে।

বাসু বললেন, তা হোক। পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট পেলে 'টাইম ফ্যাক্টরটা' হয়তো জানা যেত। ট্রেনটা বালাসোরে কখন পৌঁছায়।

দস্তুর সরাসরি জবাব দিলেন না। যন্ত্রটা তুলে নিয়ে তাঁর সেক্রেটারিকে বললেন, পামেলা, তুমি যে চার্টটা বানিয়েছ, তার দুটো কপি নিয়ে এঘরে চলে এস। ওঁরা তোমাকেও কিছু প্রশ্ন করতে চান।

চার

একটু পরে ঘরে এসে উপস্থিত হলেন, মিস্ পামেলা কাত্রোচি। বছর পঁয়ত্রিশের একজন ইতালিয়ান মহিলা—দস্তুরের সেক্রেটারি। ভারতীয় পোশাকে। বাঙ্গালোর সিন্ধের শাড়ি, স্নিভলেস ব্লাউজ। একহাতে রিস্টওয়াচ অপর হাত নিরাভরণ। দীর্ঘদেহী, মধ্যকামা, বয়েজকাট চুল, নীল চোখ। ভারতীয় কায়দায় হাত তুলে সবাইকে যৌথ নমস্কার করে বসলেন বাসু-সাহেবের পাশে। নিষ্কথায় তাঁর হাতে তুলে দিলেন দু কপি কাগজ। পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, টাইম-টেব্ল্ থেকে কপি করা। তিন-চার কপি টাইপ করেছি। পুলিশকেও দিয়েছি।

বাসু কাগজখানা হাতে নিলেন বটে, তাকালেন না। এক কপি বাড়িয়ে ধরলেন সুজাতার দিকে। বললেন; খুব ভালো বাঙলা শিখেছেন তো! কতদিন আছেন বাঙলা দেশে?

—তা বছর কুড়ি হবে। তোমার বাড়িতেই তো এটা আমার ইলেভেঙ্ছ ইয়ার। তাই না মিস্টার দস্তুর?

দস্তুর বোধকরি এটাকে 'খেজুরে আলাপ' পর্যায়ে ফেললেন। জবাব দিলেন না। পকেট থেকে পাইপ বার করে তামাক ঠেঁশতে থাকেন। সুজাতা ইতিমধ্যে টেবিলে পেতে ফেলেছে কাগজটা :

8045 ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস

কি.মি.	স্টেশান	পৌঁছায়	ছাড়ে	যাত্রাসময়
0	হাওড়া		10-15	ঘণ্টা-মিঃ
116	খড়াপুর	12-15	12-35	2.00
292	বালেশ্বর	14-40	14-45	2.05
294	ভদ্রেশ্বর	16-05	16-10	1.20
337	যাজপুর-কেওঞ্জুর রোড	16-55	16-57	0.45
409	কটক	18-15	18-25	1.18
437	ভুবনেশ্বর	19-25	19-33	1.00

মিস্ পামেলা কাত্রোচি বললেন, ঘটনার দিন ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস অন ডট রাইট-টাইম ছিল ; মানে যতক্ষণ না কলি-মার দেহটা আবিষ্কৃত হয়।

বাসু তাকে বললেন, আই সি! সোমা কী বলছে? গহনার বাস্‌টা কুপেতেই ছিল, এবং তা মিসিং?

—হ্যাঁ তাই।

—দ্যাট মে বি দ্য রীজন! —নিজের মনেই বললেন বাসু।

কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব। ডিসেম্বরেও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের একটা মৃদু শব্দ। নীরবতা ভেঙে মিস্ পামেলা বলেন, কিন্তু বাইরের লোক কীভাবে জানবে যে ওতে কী আছে? আপনারাই বলুন?

কৌশিক একটু চিন্তা করে বলে, কিন্তু বাইরের লোক যে হতেই হবে, তার কী অর্থ?

বাসু মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি। দস্তুর আর তাঁর সেক্রেটারির মধ্যে চকিত দৃষ্টি-বিনিময় হল। দুজনেই নির্বাক। বাসুই আবার বলেন, সোমা কতদিন এ বাড়িতে ওই কাজ করছে?

জবাবে দস্তুর বলেন, বাট শি ইজ হান্ড্রেড-পার্সেন্ট ফেইথফুল! অ্যান্ড বিয়ন্ড সাস্পিশন!

—বাট দ্যাট ওয়াজ নট মাই কোশ্চেন?

পামেলা বললেন, প্রায় দু বছর। দস্তুর বলতে চেয়েছিল, আমরা তাকে মেয়ের মতোই দেখি। তিনকূলে তার কেউ নেই। অর্ফানেজে মানুষ। নিজের চেষ্টায় গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। আর...তাছাড়া...দু-বছর ধরে তো দেখে আসছি—ওই যে-কথা দস্তুর বলল ; শি ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেইথফুল।

বাসু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাছাড়া সে তো ছিল তিন বগি পিছনে।

আর ছুরি চালানো মেয়েদের কাজ নয়। স্ত্রীলোক হত্যাকারী হলে দেখা যায় মেথডটা: বিষপ্রয়োগ! অলমোস্ট নাইন্টি পারসেন্ট।

দস্তুর বিরক্ত হয়ে হঠাৎ বলে ওঠেন, প্রিজ ব্যারিস্টার-সাহেব। সন্দেহের তালিকা থেকে আপনি কয়েকজনকে বাদ দিন—আমাকে, পামেলা, সোমা বা আমার বাড়ির দারোয়ান-পাচক-বেয়ারা-ড্রাইভারদের। এ-কাজ সেই স্কাউন্ডেলটার—সেই যাকে ট্রেনের কামরায় সোমা দেখেছিল বালাসোর স্টেশনে।

কৌশিক জানতে চায়, আপনার মেয়ের শেষকৃত্য কোথায় হবে?

দস্তুর জবাব দিলেন না। পকেট থেকে রুমাল বার করে চশমার কাচটা মুছতে থাকেন। পামেলা বলেন, আজ দুপুরেই আমরা বাই রোড ভুবনেশ্বর যাচ্ছি। কলি-মার হাজবেন্ড তো ওখানেই আছেন। কয়েকজন নিকট আত্মীয়ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। পৃথক গাড়িতে। ‘ফিউনারাল’ পুরীর স্বর্গদ্বারেই হবে।

বাসু জানতে চান, কমলকলির ওয়ারিশ কে? তার স্বামী?

দস্তুর আবার আলোচনায় যোগ দেন। বলেন, বিয়ের তিনমাসের মধ্যে কলি তার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি—গোটা সাতেক ল্যান্ডেড প্রপার্টি, শেয়ারস্, অন্যান্য সিকিউরিটি একটা উইল করে তার হাজবেন্ড রূপেশ মালহোত্রাকে দিয়ে বসে। আমি যখন জানতে পারি ততদিনে ওদের সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করেছে। আমি উইলটা নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল, ওদের ডিভোর্স অনিবার্য! কিন্তু কলি রাজি হয়নি!

—রাজি হয়নি! কেন? সে কি ডিভোর্স চাইছিল না?

—সর্বান্তঃকরণে চাইছিল। ওরা তো গত সাত মাস সেপারেশনে আছে। একসঙ্গে একটা রাতও কাটায়নি। কলি চাইছিল মিউচুয়াল ডাইভোর্স। স্কাউন্ডেলটা গররাজি নয়। তবে তার ডিমান্ড ছিল আকাশচুম্বী!

—তাহলে কমলকলি তার উইলটা বদলাতে রাজি হল না কেন?

দস্তুর নীরবে পাইপ টানতে থাকেন।

পামেলা বলেন, তুমি ভুল করছ মিস্টার দস্তুর। ডাক্তার আর লিগ্যাল অ্যাডভাইসারের কাছে কিছু লুকাবার চেষ্টা বোকামি!

দস্তুর তাঁর সেক্রেটারির দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, আমাকে কলি বলেছিল, উইলে একাধিকবার রূপেশকে বলা হয়েছে ‘মাই হাজবেন্ড’! সুতরাং ডিভোর্স হয়ে গেলে যদি আমার মৃত্যুই আগে হয় তাহলে রূপেশ কিছুতেই ওই উইলের প্রবেশ পাবে না। তাছাড়া...আমার আশঙ্কা...রূপেশ এমন কিছু একটা তথ্য ওর সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল যেজন্য ও উইলটা নষ্ট করতে পারেনি।

সেটা যে কী, তা আমি জানি না!

বাসু জানতে চান, ওদের কোন জয়েন্ট ব্যান্ড-অ্যাকাউন্ট ছিল?

দস্তুর তাঁর সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, যু বেটার আনসার দ্যাট কোশ্চেন।

পামেলা বলেন, না, ছিল না। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট সব ক্রোজ করে দিয়েছিল কলি। তবে আন্দাজ করা যায়, রূপেশ মাঝে মাঝেই কলির কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে যেত।

—ব্র্যাকমেলিং?

—হতে পারে। আবার নাও পারে। হয়তো স্ক্যাভালের ভয়ে। মিস্টার দস্তুর ওকে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করাতে রাজি করিয়েছিল। আমাদের অ্যাটর্নি তার কাজ শুরু করেও দিয়েছিলেন।

—রূপেশ মালহোত্রা আজকাল কোথায় থাকে?

আবার কথোপকথনে যোগ দেন দস্তুর-সাহেব, সল্ট লেকে। ওর বাপের বানানো দু'দুটি বাড়ি—আলিপুরে ও লেক গার্ডেন্সের দুটি বড় বাড়ি—ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে।

—তার মানে, পশু কমলকলি যখন রওনা হয়, সেদিন সকালে রূপেশ কলকাতাতেই ছিল?

—তাই ছিল বলে আমার ধারণা। কংক্রিট প্রমাণ নেই। অন্তত রাত আটটায় সে সল্টলেকের বাড়িতে ছিল। কারণ সেই সময় ভুবনেশ্বর থেকে পুলিশের এস. টি. ডিটা সে রিসিভ করে।

—বাড়ির টেলিফোনে? আর যু শ্যিওর? মোবাইল নম্বরে নয়?

দস্তুর একটু চমকে ওঠেন। বলেন, ওদিক থেকে আমি চিন্তা করিনি। না, সে খবরটা আমার জানা নেই!

বাসু বললেন, আপনার 'কেসটা' আমরা অ্যাকসেস্ট করলাম। এবার মিস্ হাজরার সঙ্গে একটু কথা বলব। জনান্তিকে। তাকে কাইন্ডলি পাঠিয়ে দিন।

পাঁচ

ওঁরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। ডোর ক্রোজারের অমেঘ আকর্ষণে ফ্লাসপাল্লাটা বন্ধ হয়ে গেল। সুজাতা তখন সেই নির্জন ঘরে মামুকে বলে, আমার মনে হয়...

—নট নাউ! আমাদের আলোচনাটা পরেও হতে পারে।

সুজাতার খেয়াল হল। দেওয়ালের নাকি কান থাকে! বিশেষ, অমন ইন্সটিটিউয়াল ম্যাগনেটের বৈঠকখানায় : কনসিলড্ টেপ-রেকর্ডার!

একটু পরেই এসে হাজির হল সোমা হাজরা। তারও বয়স ওই ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সেও রীতিমতো সুন্দরী। মুখাবয়ব খুব নয়নাভিরাম নয়। তবে অত্যন্ত ফর্সা এবং সুতনুকা। যুক্তকরে সবাইকে যৌথ-নমস্কার করে দাঁড়িয়ে রইল। বাসু-সাহেবের নির্দেশে আলতো করে বসল একটি সোফায়। আগে থেকে জানা না থাকলে কৌশিক বুঝতেই পারত না এই মেয়েটি ছিল কমলকলির মেইড,-সার্ভেন্ট—গৌরবে : কম্প্যানিয়ান। ওর পরনে সাদামাঠা হাল্কা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি। ব্লাউজ ম্যাচ করা নয়। প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। চোখ দুটি এখনো লাল। সেটা অস্বাভাবিক নয়। প্রথম কথা, মালকিনের আকস্মিক অপমৃত্যু, দ্বিতীয়ত ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অভাব। কমলকলি ওর চাকরিটা ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নিয়েই ওপার পানে রওনা দিয়েছে।

বাসু বলেন, তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, মা। কিন্তু তবু তোমাকে একটু বিরক্ত করব। কয়েকটা প্রশ্ন করব। প্রথম কথা : পশুদিন সকালে তোমরা যখন স্টেশনে রওনা হও তখন কি মিসেস মালহোত্রা স্বাভাবিক ছিল? না কি কোনো অস্থিরতা বা নার্ভাসনেস্-এর লক্ষণ তোমার নজরে পড়েছিল?

—আপ্তে না। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিলেন। বরং কিছুটা খুশি-খুশি মুডে ছিলেন।

—কিন্তু বালাসোর স্টেশনে তাকে অন্যরকম দেখলে?

—আপ্তে হ্যাঁ, একেবারে আলাদা মুড। কেমন যেন একটা অস্থির ভাব। আমার সঙ্গে গুছিয়ে কথাও বলতে পারছিলেন না।

—বালাসোর স্টেশনে কমলকলি তোমাকে ঠিক কী বলেছিল বলতো? আই নো, চার্বাটিম সব কথা মনে করে বলা সম্ভবপর নয়। তবু যতখানি তোমার মনে আছে—

একটু ভেবে নিয়ে মিস্ হাজরা বললে, আমি জানলার কাছে এসে দাঁড়াতে উনি কুপে থেকে বার হয়ে করিডোরে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে জানলায় ঝুঁকে পড়ে ঝুললেন, ‘সোমা, আমার প্ল্যানটা একটু বদলাতে বাধ্য হচ্ছি...আই মিন...এখনই বালাসোরে আমি নামতে পারছি না।’

—জাস্ট এ মিনিট! তোমার ঠিক মনে আছে যে, ও বলেছিল ‘প্ল্যানটা বদলাতে বাধ্য হচ্ছি’ এবং ‘নামতে পারছি না’? অর্থাৎ সে বলে নি তো যে, ‘প্ল্যানটা বদলাচ্ছি’ এবং ‘নামছি না’?

সোমা হাজরা একটু চিন্তা করে বলল, না স্যার! আদালতে হলফ নিয়ে আমি

ও কথা বলতে পারব না। তবে যদূর আমার মনে পড়ে উনি বলেছিলেন ‘বাধ্য হচ্ছি’ এবং ‘নামতে পারছি’ না।’

—ও.কে! তারপর?

—উনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন...

—নো, নো, নো! তুমি ডাইরেক্ট ন্যারেশানে ওর কথাগুলো বলে যাও, যতদূর তোমার মনে পড়ে—

সোমা আবার একটু চিন্তা করে নিল। তারপর বললে, উনি বললেন, ‘সোমা, তুমি লাগেজগুলো ক্রোকরুমে রেখে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে আমার জন্য অপেক্ষা কর। আমি রাতের মধ্যেই কোনো ডাউন ট্রেনে ফিরে এসে লেডিজ ওয়েটিং রুমে তোমার খোঁজ করব। তোমার কিছু টাকা লাগবে?’ তাতে আমি বললাম, ‘না। টাকা লাগবে না; কিন্তু কত রাত হবে আপনার?’ উনি জবাব দিলেন না। কুপের মধ্যে গিয়ে কাকে কী যেন জিজ্ঞেস করলেন। তখনই আমার নজর হল কুপের ভিতর একজন ভদ্রলোক আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ না ঘুরিয়েই তিনি দিদির কী যেন বললেন। তৎক্ষণাৎ দিদি আবার জানলার ধারে ফিরে এসে বললেন, ‘ম্যাক্সিমাম রাত দশটা। ডাউন ট্রেন কখন আছে জানি না তো। তবে আজ রাতেই ফিরব। তুমি স্টেশন ছেড়ে কোথাও যেন যেও না।’ আমি কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম—সম্ভবত জানতে চাইছিলাম উনি কোথায় যাচ্ছেন। বা কেন যাচ্ছেন—ঠিক কী জানতে চাইছিলাম তা আমার এখন মনে নেই। কিন্তু ঠিক তখনই ট্রেনটা দূলে উঠল। দিদি জানলা থেকে সরে গেলেন। ট্রেনটাও ছাড়ল।

বাসু বললেন, আই সি! তার পরের কথা তো তুমি তোমার এজাহারেই দিয়েছ। তুমি রিটার্নিং রুমের ‘বি’-কামবায় রাতটা ছিলে, সারা রাতে কমলকলি না ফেরায় তুমি বালাসোরের পুলিশ স্টেশনে একটা ডায়েরি করে পরদিন ফিরে এলে। তার মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। কিন্তু গহনার কেসটা তাহলে তোমার দিদির কাছেই থাকল? মানে, ট্রেনটা যখন বালাসোর ছাড়ে?

—তাই তো থাকার কথা। আমাকে যখন দিদি সেটা দেননি।

—হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পর বালাসোর পৌঁছানোর আগে তুমি কি ওই দিদির কামরায় গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ট্রেন ধরতে আমরা নয়টা-নাগাদ বাড়ি থেকে বার হই। তাড়াহুড়ায় দিদির তখনো ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। সেটা আমি একটা ক্যাসারোল হট-কেসে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। খড়াপুরে যখন গাড়ি দাঁড়ায়—বারোটা নাগাদ—তখন আমার কয়েকজন সহযাত্রীকে মালগুলো পাহারা দিতে বলে খাবারের কৌটোট

নিয়ে দিদির কামরায় চলে আসি। খড়্গাপুরে বিশ মিনিট স্টপেজ। দিদিকে খাবারের ক্যাসারোল হট-কেস আর কফি ভর্তি ফ্লাস্কটা দিয়ে আসি। দিদি আমার সামনেই খেতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু শেষ করতে পারেননি। ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে আশঙ্কা করে আমি সেই বাটি আর ফ্লাস্কটা রেখেই আমার কামরায় ফিরে আসি।

কৌশিক বলে, কিন্তু সেগুলো তো কুপেতে পাওয়া যায়নি?

—আমিও তাই শুনেছি। জানি না, সেগুলো কোথায় গেল।

বাসু জানতে চান, খড়্গাপুরে কমলকলি কী খেয়েছিল?

—খান দুই আলুর পরোটা, চিকেন-মটর, সালাড, আর একপিস্ সন্দেশ ছিল কৌটায়। দিদি তার কতটা কী খেয়েছিলো আমি জানি না। কী করেই বা জানব?

বাসু মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, থ্যাঙ্কস সোমা। আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। তুমি মিস্টার দস্তুরকে একবার এঘরে আসতে বল। যাও—

সোমা উঠল না। নিজে থেকেই বলে, আমার মনে হয় বালেশ্বরে যে ভদ্রলোককে আমি কুপের ভিতর দেখেছিলাম হয়তো তাঁরই প্ররোচনায় দিদি প্রোগ্রামটা বদলান।

বাসু একটু চমকে উঠে বলেন, ও হ্যাঁ! তার কথা তো তোমাকে এখনো জিজ্ঞেস করাই হয়নি। তোমার কী মনে হয়েছিল? সেই লোকটির সঙ্গে ট্রেনেই তোমার দিদির আলাপ হয়? না কি সে কমলকলির পূর্বপরিচিত?

—তা আমি কেমন করে জানব স্যার? আমি তো তাঁকে ভাল করে দেখতেই পাইনি। ট্রেন যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল তারমধ্যে তিনি একবারও এ পাশ ফেরেন নি। তাঁর মুখটাও দেখতে পাইনি।

—মুখ নাই দেখ, তার একটা শারীরিক বর্ণনা দাও। হাইট, স্ট্রাকচার, পোশাক?

—মনে হল ভদ্রলোক বেশ লম্বা। স্লিম ফিগার। গ্রে রঙের ফুলপ্যান্ট। গায়ে হাফশার্ট অথবা টি-শার্ট। ঠিক মনে নেই। তাঁর মাথায় একটা ক্যাপ ছিল, হুডওয়ালা। তিনি দিদির সঙ্গে দু-একটা কথা বলেছিলেন, কিন্তু বরাবর ওপাশ ফিরে।

বাসু পাইপটায় আগুন ধরাতে ধরাতে ফস্ করে বলে বসেন, লোকটা তোমার দিদির হাজ্জব্যান্ড মিস্টার রূপেশ মালহোত্রা নয় তো?

রীতিমতো চমকে ওঠে সোমা। সামলে নিয়ে বলে, তাঁকে আমি কয়েকবার দেখেছি। এ লোকটির হাইট এবং স্ট্রাকচার মিস্টার মালহোত্রার মতোই। তবে উনি বলে মনে হয় না।

—কেন হয় না? তুমি তো লোকটাকে শুধু পিছন থেকে দেখেছ। এদিকে আবার হাইট স্ট্রাকচার মালহোত্রার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে? তাহলে?

সোমা জবাব দিতে পারে না। বোকার মতো তাকিয়ে থাকে।

এক বৃতে দুটি কাঁটা—3

—তার মানে লোকটা মিস্টার মালহোত্রা হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। তাই না? এ-কথাই তো বলতে চাইছ?

শব্দ বার হল না মিস্ হাজরার মুখ থেকে। নীরব শিরশ্চালনে সে স্বীকৃতি জানানো।

—তুমি কুমার বিক্রমজিতের নাম শুনেছ? চেন তাঁকে?

এবারও সোমা চমকে ওঠে। বলে, কুমার বিক্রমজি? দিদির বন্ধু? ই্যা তাঁকে একবার দেখেছি। কেন বলুন তো?

—লোকটা কুমার বিক্রমজি নয় তো?

—না, তা মনে হয় না।

—কেন?

—তাছাড়া কতটুকু সময় তাঁকে দেখেছি বলুন?

—তা তো বটেই! তবে পরে যদি প্রমাণিত হয় লোকটা কুমার বিক্রমজি তাহলেও তুমি অবাক হবে না। তাই না?

—ই্যা, সে কথা ঠিক। আমি তো তাঁকে খুঁটিয়ে দেখিনি।

—কেন? তোমার তো প্রচণ্ড কৌতূহল হবার কথা। কৌতূহল হয়নি তোমার?

—ই্যা, তা হয়েছিল। কি জানি, আমি ঠিক জানি না।

বেশ বোঝা যায় এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের অভিজ্ঞতা তার নেই। সে বেশ ঘাবড়ে গেছে।

—ঠিক আছে এবার এস তুমি। মিস্টার দস্তরকে পাঠিয়ে দাও।

সোমা উঠে দাঁড়ায়। চলতে গিয়েও কী ভেবে থেমে পড়ে। হঠাৎ প্রশ্ন করে, সেদিন দিদি কী রকম ড্রেস পরেছিলেন জানেন?

বাসু তৎক্ষণাৎ বলেন, ই্যা শুনেছি। একটা চাঁপা-রঙের মূর্শিদাবাদী।

—চাঁপা রঙের মূর্শিদাবাদী? কে বলেছে?

—কার এজাহারে সে কথা আছে তা তো মনে পড়ছে না। বোধহয় সেই মেরিন এঞ্জিনিয়ারের স্টেটমেন্ট-এ। কেন বলতো?

সোমা দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, তাহলে সে ভদ্রলোক কালার ব্লাইন্ড। দিদি পরেছিলেন ডীপ কালো একটা চাইনিজ শিফনের শাড়ি, সেই সঙ্গে স্ট্রীভলেস কালো ম্যাচিং ব্লাউজ। অমন পোশাকে ফর্সা রঙের দিদিকে যে কী দারুণ দেখাচ্ছিল।

বাসু বললেন, না, এতক্ষণে মনে পড়েছে। চাঁপা রঙের মূর্শিদাবাদীর কথাটা বলেছিল সেই জি-আর-পির ইন্সপেক্টর—যে ডেডবডি কুপে থেকে স্টেশানে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করে।

সোমা প্রতিবাদ করে, তাহলে সেই পুলিশ অফিসারকেই চোখ দেখাতে বলুন। সে লোকটাই কালার-ব্লাইন্ড।

বাসু বলেন, তা কেন? তুমি তো তোমার দিদিকে দেখেছিলে বালাসোর স্টেশন পর্যন্ত আর বডিটা পাওয়া যায় ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে। কমলকলি হয়তো নির্জন কুপেতে ইতিমধ্যে শাড়িটা পাল্টে ছিল।

রুখে ওঠে সোমা—কী করে পালটাবেন? তাঁর স্যুটকেস তো আমার জিম্মায়? তাঁর কাছে তো ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া কিছুই ছিল না।

বাসু মাথা নাড়লেন, তা বটে। তুমি যে আরও গুলিয়ে দিলে ব্যাপারটা! আর যু শ্যুওর বাড়ি থেকে সে কালো শিফনের শাড়ি পরেই বেরিয়েছিল।

—কী আশ্চর্য! আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি তাঁর কম্পানিয়ান। সকাল নয়টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত তাঁকে বারে বারে দেখেছি। বাড়িতে, গাড়িতে, হাওড়া স্টেশনে, খড়্গপুরে, বালাসোরে...

সুজাতা আর থাকতে পারে না। বলে, আপনিই কিছু উল্টোপাল্টা করছেন, মামু! মেয়েরা কখন কী শাড়ি পরে আছে তা শুধু মেয়েরাই নজর করে। আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, দস্তুর-সাহেবের স্টেটমেন্টেও ‘কালো রঙের’ শাড়ির উল্লেখ ছিল। চাঁপারঙের নয়।

—দস্তুর? দস্তুর আবার শাড়ির রঙের উল্লেখ করল কখন?

—ওই যখন বর্ণনা করছিলেন যে, মিস্ হাজরা ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমের মহিলা ইনচার্জকে বলছে, ‘খুব ফর্সা একজন কালো রঙের শিফন শাড়িপরা মহিলা যদি ওর খোঁজ করেন...’

বাসু বিহ্বল হয়ে বলেন, ‘কালো’? আমার যদুর মনে পড়ে উনি ‘চাঁপা রঙ’ বলেছিলেন...কী জানি। বাট দ্যাটস্ নাইদার হিয়ার নর দেয়ার! শাড়ির রঙে কী আসে যায়?

ছয়

ঘরের বাইরে আসতেই দেখা হয়ে গেল দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে। উনি বললেন, আপনাদের খবর নিতেই আসছিলাম। ইন্সপেক্টর দাশ এসেছেন, ও-পাশের উইং-এ অপেক্ষা করছেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

বাসু বলেন, নিখিল একটু বসুক। তার আগে আপনার সঙ্গে দু-একটা জরুরি কথা সেরে নিই।

—চলুন, তাহলে আবার ঘরে গিয়ে বসা যাক।

ওঁরা ফিরে এলেন সেই বৈঠকখানায়। দস্তুর বলেন, এবার বলুন?

—না, আমি বলব না, বলবেন তো আপনি!

—আমি! মানে? আমি কী বলব?

—সেই বিশেষ কথাটা, যা আপনি এখনো আর কাউকে বলেননি, বলতে পারছেন না—barring possibly Miss Pamela!

একটু রাগত স্ববে দস্তুর বলেন, হোয়াট ডু যু মিন? আমি আপনাব কাছে কিছু লুকোচ্ছি? অফ অল পারসেঁজ : আমি! যে আমি আপনাকে ডেকে এনে এ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি?

বাসু জবাব দিলেন না। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দস্তুরের চোখের দিকে। দস্তুর বলেন, কী হল? কিছু একটা বলুন?

বাসু প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললেন, অলরাইট, আমিই বলছি: আয়াম একট্রিম্‌লি সরি মিস্টার দস্তুর! আপনি যদি আপনার এই স্ট্যান্ড না বদলান—সেই গোপন কথাটা বলতে রাজি না থাকেন—তাহলে আই'ল ওয়াশ মাই হ্যান্ডস্ অফ্ দিস্ কেস। রাইট নাউ!

উঠে দাঁড়ালেন বাসু। দস্তুরও। তারপর তিনি দু-হাত কোমরের দুদিকে রেখে মাথা নিচু করে কয়েকটা মুহূর্ত চিন্তা করলেন। এবং তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা গোলাপী রঙের খাম বার করে বাসু-সাহেবের হাতে দিলেন। বললেন, আই হোপ দিস্ উইল স্যাটিসফাই য়ু।

বাসু ওই খাম থেকে একই রঙের কাগজে লেখা একটি চিঠি বার করলেন। একবার চোখ বুলিয়ে কৌশিকের দিকে বাড়িয়ে ধরেন। সুন্দর ঝকঝকে হস্তাক্ষরে ইংরেজিতে লেখা ছোট চিঠি। বাঙলা করলে দাঁড়ায় :

কলি...আমার কলি।

ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছে যে, আমাদের সেই পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। আবার তোমাকে কাছে পাব, পাশে পাব। তোমার হাতে রাখব আমার হাত! তোমাকে কাল সকালেই চাঁদিপুর যেতে হবে শুনে ভীষণ খারাপ লাগছে। সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যোদয় তাহলে আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখব না? না! তা হবে না। হতে পারে না। তার আগেই তোমার-আমার দেখা হবে! কী ভাবে? বলব না। তবে জেনে রাখ, আমার অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কোন শব্দ নেই।

তোমারই 'অলি'

চিঠিটা পড়ে, ভাঁজ করে খামের মধ্যে ভরে বাসু-সাহেবের হাতে ধবিয়ে দিল কৌশিক। সুজাতাও ঝুঁকে পড়ে পাঠ করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। খামটা ফেরত পেয়ে দস্তুর সেটা পকেটে রাখলেন। বললেন, এটার কথা এখনি পুলিশকে বা আর কাউকে জানাবেন না প্লিজ।

বাসু বললেন, কোথায় পেলেন এটা? আর কবে?

—পেয়েছি কাল দুপুরে। কলির ড্রয়ার ঘাঁটতে বসে।

—ড্রয়ার কি চাবিবন্ধ ছিল?

—ছিল। কিন্তু আমার কাছে এ বাড়ির সমস্ত চাবির ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ওর দরাজের ডুপ্লিকেট চাবিটা কোনদিন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। কালই প্রথম।

—আপনার সেক্রেটারি জানেন?

—হ্যাঁ। বর্তমানে আমরা পাঁচজন জানি।

—হাতের লেখাটা চেনা? এবার কি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

—হস্তাক্ষর আমার অপরিচিত ; কিন্তু এবার কিছুটা বোধহয় ‘গ্যেস্’ করতে পারছি।

—কুমার বিক্রমজিৎ?

—পামেলার তাই ধারণা। আমারও!

—কিন্তু কীভাবে চিঠিটা এ-বাড়িতে এল?

—আমার জানা নেই। কুরিয়ার সার্ভিসে সম্ভবত।

—আপনার মেয়ে যে আবার ওই স্কাউন্ডেলটার খবরে পড়েছে তা টের পাননি?

দস্তুর বললেন, দেখুন বাসু-সাহেব, আমার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্কা। সে তার জীবন কী ভাবে কাটাবে তার ভিতর আমার এখন আর নাক গলানো ঠিক নয়! ইনফ্যান্ট, হতভাগীটা খুন না হয়ে গেলে আমি কোনদিনই তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখতাম না। কী বলব আপনাকে—কলির মৃত্যুসংবাদের চেয়ে এই গোলাপী খামখানা আমাকে কিছু কম আঘাত দেয়নি। কিন্তু আগেই বলেছি, আঘাত আমি সহিতে প্রস্তুত, ইনসাল্ট নয়। খুন যেই করে থাক আমার অনুরোধ আপনি খুঁজে বার করুন, আমাকে নুকিয়ে কে আমার বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রেম করছিল।

বাসু বললেন, চলুন এবার ওঘরে যাওয়া যাক।

ওপাশের উইংস-এ ঢুকতেই সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো নিখিল দাশ। পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষা-বিভাগের হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের একজন হেভিওয়েট অফিসার। নীচদিনের পরিচয় এঁদের সঙ্গে এবং বাসুর স্নেহধন্য। বলে, আমার ষষ্ঠ ইন্ড্রিয় বলছিল

এ কেসে আপনার গাইডেন্স পাব। তাই আপনি নয়টার সময় আসছেন শুনে একঘণ্টার মার্জিন দিয়ে চলে এলাম।

বাসু বলেন, তা ওই একঘণ্টার মার্জিনটা কেন?

—আপনার প্রাথমিক তদন্তের জন্য একঘণ্টা সময়ই কি যথেষ্ট নয়?

ওঁরা চারজন চারটি সোফায় আসন গ্রহণ করেন।

বাসু-সাহেব জানতে চান, তা কেমন বুঝ?

নিখিল বলে, প্রাইম সাসপেক্ট রূপেশ মালহোত্রা। ঘটনার দিন ও বাড়িতে ছিল না। আপনি এতক্ষণে নিশ্চয় জেনেছেন যে, ওরা সেপারেশনে ছিল। কমলকলি থাকতেন এখানে, আর মিস্টার মালহোত্রা তাঁর সন্টলেকের বাড়িতে। গতকাল মিস্টার মালহোত্রা বাই রোড ভুবনেশ্বরে রওনা হয়ে যাবার পর আমরা গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছি। আঠাশ তারিখে তিনি বাড়িতেই ছিলেন; কিন্তু ঘটনার দিন—উনত্রিশে, বুধবার, তিনি সকাল থেকেই অনুপস্থিত। মানে, তাঁর বেড-টিও অস্পর্শিত পড়ে ছিল। উনি শেষরাত্রে যখন উঠে, কোথায় বুঝি চলে গেছেন। বাড়ির লোক জানে না। ঘরটা খোলা ছিল। সাড়ে ছয়টায় ওঁর বেয়ারা টিপয়ে টি-কোজি দিয়ে ঢাকা চায়ের ট্রেটা রেখে যায়। তার ধারণা হয়েছে—সাহেব বুঝি বাথরুমে। বাসু! তারপর রাত এগারোটা পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন তা বাড়ির কেউ জানে না। ভেরি মিস্টিরিয়াস!

বাসু বলেন, কিন্তু রাত আটটা নাগাদ ভুবনেশ্বর স্টেশনের এস. আর. পি. তো রূপেশকে এস. টি. ডি করে খবরটা জানায়।

—বাড়িতে নয়। মোবাইল নম্বরে। সে কোথা থেকে মেসেজটি পায় তা জানা যায় না।

বাসু বলেন, ডেডবডি ভুবনেশ্বর স্টেশনে এসেছে সাড়ে সাতটায়। আধঘণ্টার মধ্যে রেলওয়ে এস. পি রূপেশের মোবাইল নম্বর পেয়ে গেল কী করে? সেটা সম্ভব?

নিখিল মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না। খোঁজ নেব।

দস্তুর বলে ওঠেন, খোঁজ নিতে হবে না। আমি জানি। কলি —আই মিন কমলকলির হাত-ব্যাগে একটা ছোট টেলিফোন রেডি-রেকর্ডার থাকে। তাতে তার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিশ্চয় ছিল। মৃতদেহের সঙ্গেই সেটা হস্তগত হয়েছে পুলিশের।

বাসু পাইপে তামাক ঠেংতে ঠেংতে বলেন, প্রাইম সাসপেক্ট ছাড়া আরও একজনের ‘অ্যালেবাইটা’ তোমাকে, যাচাই করে দেখতে হবে, নিখিল। লোকটা ভবঘুরে। আজ এখানে, কাল সেখানে। কিন্তু বর্তমানে কলকাতায় আছে। থাকলে

কোনো খানদানী হোটেলে।

নিখিল বললে, করেছি, স্যার। আপনি কুমার বিক্রমজিতের কথা বলছেন তো?

—হ্যাঁ, তাই বলছি, কিন্তু তুমি আন্দাজ করলে কী করে?

—সময়ের দিক থেকে আমি তো আপনার চেয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লীড নিয়ে বসে আছি, স্যার। মিসেস মালহোত্রার সমস্ত অতীতটাই আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হয়েছে। ‘কঙ্কতিকা সম্মার্জনী’ চালিয়ে।

তারপর হঠাৎ মিস্টার দস্তুরের দিকে ফিরে বললে, আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার। ইট্‌স্‌ আ কেস্‌ অব মার্ডার! তাই সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করছি। আপনি যে বছর-তিনেক আগে পুলিশের সাহায্যে ওই লোফারটাকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাও আমাদের জানা।

দস্তুর বললেন, লুক হিয়ার, ইন্সপেক্টার! কমলকলি বর্তমানে নিন্দা জুতির ওপারে। আপনারা যা করছেন, তাতে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। কারণটা আপনিই বলেছেন : আফটার অল্‌ ইট্‌স্‌ আ কেস্‌ অব মার্ডার! আমি চাই খুনী লোকটাকে ফাঁসির দড়ি থেকে ঝোলাতে। অ্যাট এনি কস্ট! কিন্তু কলির নামে কতকগুলো কুৎসা সংবাদপত্রে ছাপা হলে আমি ব্যথিত হব। এই যা!

নিখিল বললে, আই রেসপেক্ট য়োর সেন্টিমেন্ট, স্যার, অ্যান্ড অ্যাপ্রিশিয়েট য়োর পয়েন্ট।

বাসু জানতে চাইলেন, আমার খবরটা কি ঠিক? মানে কুমার বিক্রম কি এখন কলকাতায়?

—আপ্তে হ্যাঁ, ছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ। হোটেল ‘রাতদিন’-এ। তারপর ঘটনার দিন, মানে ওই বুধবার সকাল নয়টায় তিনি হোটেল থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে যান। ট্যাক্সিতে। কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখে।

—তুমি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছিলে—হোটেলের ট্রাভল এজেন্টের মাধ্যমে সে কোনো প্লেনের বা ট্রেনের টিকিট খরিদ করেছিল কি না।

—সেটা তো এলিমেন্টারি স্যার। দেখেছি। না, হোটেলের মাধ্যমে সে কোনো টিকিট কাটেনি। কিন্তু চেক-আউট টাইমটা খুব কম্পিকুয়াস। ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছাড়ে দশটা পনেরয়।

সুজাতা প্রশ্ন করে, এটা যদি বিক্রমজিতের কাজ হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মিসেস মালহোত্রার মাধ্যমেই সে জানতে পেরেছিল ও ফাস্ট ক্লাস সিকুপেতে বালাসোর যাচ্ছে। এবং একাই।

দস্তুর বলেন, কিন্তু আমি যে যাব না, এটা তো আমি কলিকে জানিয়েছিলাম

একবারে শেষ মুহূর্তে। তখন কি চেষ্টা করলেও অন্য কেউ ফাস্ট ক্লাস টিকিটের রিজার্ভেশন পাবে?

নিখিল বলে, আনরিসার্ড সেকেন্ড ক্লাসে গেলেই বা ক্ষতি কী? ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস তো ভেস্টিবুল ট্রেন। চলতি গাড়িতেও এ কামরা ও কামরা করা যায় হয়তো সে খড়গপুরে কামরা বদলে ফাস্টক্লাস বগিটায় চলে আসে।

বাসু বললেন, আমার খটকা লাগছে দু-একটা কারণে। প্রথম কথা : মোটিভট যদি ধরে নিই সেই আট দশ লাখ টাকার গহনা, তাহলে বলব, এ জাতীয় রাহাজানি যারা করে তারা একটা বিশেষ শ্রেণীর লোক। কুমার বিক্রমজিৎ—সে যতই লম্পট হোক—সে ক্লাসে পড়ে না। তার পক্ষে চোরাই মাল পাচার করা অত্যন্ত কঠিন খুন করা আরও!

নিখিল বলে, কিন্তু তার বিজনেসটা যে কী জাতের, তা তো আমরা জানি না স্যার? সে দু-তিন মাস অন্তর ওদিকে দুবাই, বেরুট, কুয়েৎ যায়, এদিকে রেঙ্গুণ সিঙ্গাপুর হংকং। তার ব্যবসাটা হীরে-জহরতের স্মাগলিং হলে আমি অন্তত আশ্চর্য হব না।

—না, আমিও না, বললেন বাসু। তারপর যোগ করলেন, কিন্তু ও জাতের অ্যান্টিসোশাল যদি পরিকল্পিত মার্ভার করে—হঠাৎ করে বসা হোমিসাইড নয়—তাহলে অস্ত্রটা রিভলভার হওয়ার সম্ভাবনা নাইন্টি-ফাইভ পারসেন্ট। ছোরা যদি মারণাস্ত্র হয়—অত কাছাকাছি থেকে, তাহলে চলতি ট্রেনে আততায়ীকে রক্তের ধারামানে হয়তো অবগাহন করতে হবে। তার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা হয়ে যাবে নাইন্টি নাইন পারসেন্ট।

—মানলাম। কিন্তু মিসেস মালহোত্রা যে ছোরার আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন এট প্রতিষ্ঠিত সত্য। বুলেট উদ্ভ নয়। অস্ত্রটা অবশ্য পাওয়া যায়নি; কিন্তু পোস্টমর্টাম না করেও যে ডাক্তারবাবু ওর ডেথ-সার্টিফিকেট দিয়েছেন তিনি স্পষ্ট করে লিখেছেন মৃত্যুর হেতু : স্ট্রোক উদ্ভ!—ছোরার আঘাতে।

কেউ কোন কথা বলল না প্রায় বিশ সেকেন্ড। তারপর বাসুই বলেন, চুরি যাওয়া গহনাগুলোর লিস্ট তোমার কাছে আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর কম্পানিয়ান, সোমা দেবী লিস্ট মিলিয়ে সেগুলো বাস্তব তুলেছিল তাঁর কাছ থেকে সেটা আমি পেয়ে গেছি। অল দ্য আইটেমস্—তাদের ডেসক্রিপশান, হীরে চুনি পান্নার সংখ্যা আর ডিটেইলস্। গহনা থেকে খুলে নিয়ে বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। চোরাবাজারের সমস্ত ঘাঁটিতে সেই লিস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ মিস্টার রূপেশ মালহোত্রাকে

অনারেবল্ এক্সেপসান হিসাবে ধরে নিলে হত্যার উদ্দেশ্য একটাই : জুয়েল থিফের কাজ। রেলের ছিঁচকে চোর চুরি করতে পারে ; কিন্তু খুন?—নেভার।

বাসু জানতে চান, তুমি কি আজই ভুবনেশ্বর রওনা দেবে?

—দেবে মানে? দিয়ে বসে আছি। যাবার পথে দস্তুর সাহেবের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছি। ওঁরাও আজই দুপুরে যাচ্ছেন। বাই রোড। কিন্তু ওঁদের উদ্দেশ্য শেষ কাজ। পুরীতে। আমার ডেস্টিনেশন : ভুবনেশ্বর।

—প্রথমে কোথায় যাবে?

—খড়াপুর। বালেশ্বরেও দাঁড়াব, তারপর একে একে ভদ্রক, যাজপুর রোড, কটক। ফাইনালি ভুবনেশ্বর। আমি বালাসোরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাকি পথটা ট্রেনে যেতে চাই। প্রতিটি স্টেশনেই আমাকে খোঁজ নিতে হবে। মিস্ হাজরা তাঁকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছেন বালাসোরে—বেলা পৌনে তিনটায়। আর মিস্টার পট্টনায়ক তাকে মৃতাবস্থায় দেখেন কটকে, সন্ধ্যা সওয়া ছয়টার। তার মানে হত্যাকাণ্ডটা অনিবার্যভাবে ঘটেছে—বালেশ্বর-কটকের মাঝখানে। রেললাইন অনুসারে ভৌগোলিক দূরত্ব 177 কিলোমিটার ; সময়ের ব্যবধান সাড়ে তিন ঘণ্টা। আগামীকাল রাত্রে অথবা পৰ্ণসকালে আমি কলকাতা ফিরব আর তৎক্ষণাৎ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

সাত

ফেরার পথে গাড়িতে সুজাতা প্রশ্ন করে, বিক্রমজিতের চিঠিখানার কথা আপনি জানলেন কী করে?

—জানতাম না তো। আন্দাজ করেছিলাম।

—সেটাই বা কী করে?

—হিউম্যান সাইকোলজি। হত্যাকাণ্ডের প্রাইম সাসপেক্ট রূপেশ মালহোত্রা। পুলিশও তাই ভাবছে। দস্তুরও। কলির সঙ্গে তার লিগ্যাল ডিভোর্স হয়নি। রূপেশ মৃত কমলকলির স্বামী। উইল মোতাবেক তার ওয়ারিশ। হত্যাপর্যায়ে সে যদি সাজা না পায়, আর উইলের এক কপি যদি তার কাছে থেকে থাকে তাহলে কমলকলির যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সে সহজেই দখল করবে। দস্তুর—উইথ অল হিজ হাফিং অ্যান্ড প্যাফিং কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু রূপেশকে ফাঁসাবার জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। পুলিশই তা করছে এবং করবে। তাহলে দস্তুর তড়িঘড়ি আমাকে ডেকে পাঠালো কেন? তার কাছে এমন কিছু ক্লু নিশ্চয়ই আছে, যা সে

পুলিসকে জানাতে পারছেন না—স্ব্যাভালের ভয়ে। তাছাড়া তার অবচেতন মন চাইছে রূপেশই হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত হক। একমাত্র তা হলেই সে তার কন্যাকে দান করা কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবে। সেগুলো ওই লোফারটার মাধ্যমে রেসকোর্সে ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো হয়ে যাবে না। বিক্রমজিতের চিঠির কথা আমি জানতাম না। কিন্তু রূপেশ ছাড়া অন্য কোনো লোককে যে দস্তুর সন্দেহ করছে এটা নিশ্চিত। সেটার একটা জোরালো কারণ আছে—আর তার ক্রুটা যে দস্তুরের আঙ্গিনের তলায়, তা আশা করেছিলাম। দেখা গেল আমার অনুমান নির্ভুল। দস্তুর যে বলেছিল ওই গোলাপী চিঠিখানির আঘাত তার কন্যার মৃত্যুর সমতুল্য, তা সেটা বাগাড়ম্বর নয়। সে বিক্রমজিতকে ও ব্যাপারে চিহ্নিত করেছে। তাকে মর্মান্তিক প্রত্যাঘাত করতে চায়—তাকে ফাঁকি দিয়ে ওই ছোকরা যে তার বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে প্রেম করছে এতে সে অপমানিত বোধ করেছে। বাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অব অ্যাকুইটিং রূপেশ। এ জন্যই সে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। এই ভেবেই ওকে চালেঞ্জ করেছিলাম।

এই সময় কৌশিক বলে ওঠে, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, মামু।

বাসু তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, সেটা বাড়ি গিয়ে। গাড়ি চালাতে চালাতে নয়। লুক অ্যাট দ্য রোড!

লাঞ্চ টেবিলে বাসু-সাহেব বলেন, হ্যাঁ, অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা! এবার বল কৌশিক কী ছিল তোমার প্রশ্নটা?

কৌশিক বলে, না, প্রশ্ন ঠিক নয়, আমি সমস্ত ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিতে চাইছিলাম। জানতে চাইছিলাম আপনার মতামত।

—ঝালিয়ে নেও।

আমার প্রথম যুক্তি, কমলকলি হত্যামামলার অপরাধী আমাদের চেনা-জানা লোকের বাইরে কেউ নয়। কারণ অজানা অচেনা কোন অ্যান্টিসোশালের পক্ষে জানা সম্ভবপর নয় যে, ওর কাছে ট্রেনের কামরায় আট দশ লাখ টাকার গহনা আছে। ফলে খুনিকে আমরা চিনি। যদিও তাকে চিহ্নিত করতে পারছি না। আপনি একমত?

—না। আদৌ নয়। হয়তো হত্যাকারী আমাদের অপরিচিত। একজন পেশাদারী মার্ডারার। তবে আমাদের পরিচিত কোন লোকই তাকে এ কাজে লাগিয়েছে।

—তা যদি হয়, তাহলে ওই সঙ্গে মেনে নিতে হবে যে, তাকে নিয়োগ করতে পারে একমাত্র একজন লোকই—রূপেশ মালহোত্রা। হয়তো প্রফেশনাল মার্ডারারের প্রাপ্য সে মিটিয়েছে সেই গহনা দিয়ে। তাকে ওগুলো নিয়ে সরে পড়ার সুযোগ দিয়ে।

ডু যু এগ্রি?

—না। আদৌ নয়। রূপেশ ছাড়াও অন্য কেউ প্রফেশনাল মার্ভারার নিয়োগ করে থাকতে পারে।

—আর কার স্বার্থ থাকতে পারে? কমলকলির উইলের তো একজনই ওয়ারিশ?

—উইল কি একা কমলকলিই বানাতে পারে? আর কেউ বানায় না?

—আবার কে? বানালেও এ কেসে তার রেলিভেন্স কী?

বাসু এবার তাঁর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, তুমি ও-বেলা একটা প্রশ্ন করেছিলে, রানু। আমি বলেছিলাম জবাবটা আমি জানি না। এখন তার জবাবটা আমি জেনে গেছি। বলব?

রানু আর এক হাতা লাউ চিংড়ি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, ও বেলার প্রশ্ন এ বেলা বাসি হয়ে গেছে। জবাবটা আমারও জানা।

বাসু-সাহেব—যাঁর চমক দেবার একচেটিয়া অধিকার—চমকে উঠে বলেন, কী প্রশ্ন? আর কী উত্তর বল তো?

ও বেলা আমি জানতে চেয়েছিলাম কমলকলি শৈশবে মাতৃহারা হবার পর দস্তুর আবার কেন বিয়ে করেনি। আর তুমি বলেছিলে যে, তুমি জান না। এবেলা ও প্রশ্নটা তামাদি হয়ে গেছে। কারণ আমি জানি : কেন।

বাসু রীতিমতো অবাক হয়ে বলে ওঠেন, ম্যাগনিফিক! তা সে প্রশ্নের উত্তরটা তুমি কী করে জানলে তা বুঝে গেছি। সুজাতা নিশ্চয় সাতকাহন করে সকাল বেলাকার গল্প করেছে। কিন্তু কেমন করে বুঝলে যে, সেই প্রসঙ্গটাই আমি তুলছি?

রানু মিচকি হেসে বললেন, এলিমেন্টারি ওয়াটসন! তুমি দ্বিতীয় উইলের প্রসঙ্গ তুলতেই বোঝা গেল—এবার দস্তুরের উইলের কথা হচ্ছে। হয়তো পামেলা বুঝতে পেরেছে দস্তুরের দ্বিতীয়বার বিবাহের পথে একমাত্র কাঁটা ওই মেয়েটা—যে এখন দস্তুরের উইল মোতাবেক ওয়ারিশ। কারণ প্রসঙ্গটা উঠেছিল প্রফেশনাল মার্ভারার এনগেজ করা নিয়ে।

সুজাতা বললে, আমি মামিমার সঙ্গে একমত। প্রফেশনাল খুনি এনগেজ করা হয়েছে যদি প্রমাণিত হয় তবে তার পশ্চাৎপাদ একজন নয়—দুজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

কৌশিক একটু অবাক হয়ে বলে, মিস পামেলা? আমার বিশ্বাস হয় না।

সুজাতা রুখে ওঠে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। আমরা একটা অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান করছি। সম্ভাব্য আততায়ী কে? সেক্ষেত্রে মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চিকে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যায় না। সকালবেলা দেখলাম দস্তুর

সাহেবকে সে বরাবর ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করে গেল। দস্তুর ওর এমপ্লয়ার, ওর ‘বস’। তাকে ‘আপনি’ বলে কথা বলাই শোভন ও স্বাভাবিক—বিশেষ তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে।

কৌশিক বলে, তার অন্য কারণ থাকতে পারে। উনি বিদেশী। ভালো বাঙলা জানেন না। হয়তো ‘আপনি-তুমি’ গুলিয়ে যায়।

—ঘোড়ার ডিম! মামুকে, তোমাকে আমাকে তিনি বরাবর ‘আপনি’ সম্বোধন করে গেলেন। ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, কোট ‘দস্তুর ওকে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করাতে রাজি করিয়েছিল। আমাদের অ্যাটর্নি তার কাজ শুরু করেও দিয়েছিলেন।’, আনকোট। আসলে কী জানেন, মামু, মেমসাহেবের ‘চাঁপা কলিরঙ দেখলেই এ দেশী ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়।

বাসু বলে ওঠেন, নো নো নো। দিস্ ইজ নট দ্যা ভেনু ! দাম্পত্যলাপ লাঞ্চ টেবিলে নয়। শয়নকক্ষে।

কৌশিক ব্যাপারটা সামলে নিতে বলে, কিন্তু মামু, চাঁপারঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ির কথাটা হঠাৎ আপনার মনে হল কেন? ও-কথা তো কেউ বলেনি।

ছুরি কাঁটা প্লেটে নামিয়ে দিয়ে বাসু চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বলেন, সেটাই তো ট্র্যাজেডি মিস্টার ‘সুকৌশলী’! যু সী, বাট যু ডোন্ট অবজার্ভ।

কৌশিক রুখে ওঠে,—কী দেখি, আর লক্ষ্য করি না? ‘চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী’র কথা কে কখন বলেছে? বলুন?

বাসু এবার পুড়িঙের বৌলটা কাছে টেনে নিতে নিতে বলেন, ঠিক আছে বাপু, ঠিক আছে! ওটা না হয় তোমাদের মামুর একটা স্লিপ অব টাং হয়েছিল। তা এমন ভুল কি আর সবাই করে না? করেনি? হোম্‌স্? প্যারোঁ? ব্যোমকেশ অথবা তোমাদের ফেলুদা?

সুজাতা কৌশিক পরস্পরের দিকে তাকালো। হঠাৎ দুজনেই গভীর হয়ে গেল। ওরা দুজনেই বুঝতে পারে ‘চাঁপা-রঙের মুর্শিদাবাদী’ শাড়িটার একটা প্রাসঙ্গিকতা আছে! কী সেটা? বাসু-মামু তো এমন ভুল করেন না!

রানু বলেন, চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদীর ব্যাপারটা কী?

বাসু বলেন, বাদ দাও ওসব ফালতু কথা। কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে। নিখিলকে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলা হয়নি—মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চির আদি নিবাসটা কোথায়। ইতালি না সিসিলি?

সুজাতা জানতে চায়, কেন? তাতে কী সুরাহা হবে?

কৌশিক প্রত্যাঘাতের এই সুযোগটা ছাড়ে না। স্ত্রীকে বলে, সেটা জানতে হলে

কিছু পড়াশুনা করা প্রয়োজন। মারিয়া পুজোর ‘দ্য গডফাদার’, ‘দ্য লাস্ট ডন’, ‘দ্য সিসিলিয়ান’, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা : ‘OMERTA’ !

বাসু আবার বলে ওঠেন উচ্ছ্ব। এখানে নয়—ওসব দাম্পত্যলাপ মশারি ফেলা জনান্তিকে প্লিজ!

রানু বলেন, সুজাতার কাছ থেকে গোটা কেসটা শুনেছি। এ কথা নিঃসন্দেহ যে রূপেশ মালহোত্রা হচ্ছে প্রাইম সাস্পেক্ট। এমন কি তার ‘অ্যালেবাই’ প্রতিষ্ঠিত হলেও ধরে নিতে হবে যে, সে ‘প্রফেশনাল’ ‘মার্ডারার’ নিয়োগ করেছিল। কারণ কমলকলির মৃত্যুতে সেই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, পামেলা কাত্রোচ্চি। সিসিলিয়ান ঘরানার হলে ওর রক্তের মধ্যেই এটা আছে। তার মোটিভও স্পষ্ট বোঝা যায়। সে বুঝেছে কমলকলি জীবিত থাকতে দস্তুর ওকে বিয়ে করবে না। ওদের সোসাইটিতে এমন বিয়ে হামেহাল হয়। ফলে দস্তুর কেন তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করছে না বোঝা কঠিন। তবে এটা নিশ্চিত যে, কমলকলি জীবিত থাকতে দস্তুর তার উইলটা পালটাবে না। থার্ডলি : কুমার বিক্রমজিৎ! তার ক্ষেত্রে আট দশ লাখ টাকার ওই গহনার পুঁটুলি ছাড়া লাভের অঙ্কে আর কিছু পড়ছে না! তবে কৌশিকের সঙ্গে আমি একমত। অর্থাৎ নিজে হাতে খুন যেই করে থাক : ‘প্রাইম মুভার’ আমাদের অপরিচিত কেউ নয়।

আট

ঠিক দুদিন পর ভোরবেলা এল নিখিলের টেলিফোন। বাসু-সাহেব তখনো প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে আসেননি। রানুই ফোনটা ধরলেন। নিখিল বলল, খড়্গাপুর থেকে বলছি, মামিমা। আমি ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যে কলকাতায় ফিরব। সরাসরি আপনাদের বাড়িতে যাব। স্যার যেন আমার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করেন। অ্যারাউন্ড বেলা দশটায়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। সাম ভেরি ভাইটাল ক্লুজ।

রানু বলেন, বলব। দশটার সময় উনি বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু তুমি বাপু কাকলিকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিও। সে বেচারিও ব্যস্ত হয়ে আছে।

নিখিল হেসে ফেলে। টেলিফোনেই বলে, ঠিক আছে, মামিমা! তাকেও জানিয়ে রাখব। আমি বাড়ি না ফিরে সরাসরি নিউ আলিপুরে গেলে সে রাগ করবে না।

নিখিল এসে পৌঁছলো ঠিক দশটা দশে। বেচারি মুখ খুলবার আগেই রানু জানতে চান, ব্রেকফাস্ট হয়েছে? না কি নাওয়া-খাওয়া ভুলে দৌড়াদৌড়ি করছ?

নিখিল বলে হ্যাঁ, কিছু খাব মামিমা। খিদে পেয়ে গেছে। সকাল থেকে কিছুই

খাওয়া হয়নি।

—তাহলে বাইরে গিয়ে তোমার ড্রাইভারকেও বলে এস। সে যেন দোকানপাটে না দৌড়ায়। সে বেচারির জলখাবারও বিত্তকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বাসু নিখিলকে আহ্বান করে বললেন, এস এস মিস্টার দাশ, অব খুনখারাপি বিভাগ।

নিখিল হাসতে হাসতে বলে, ‘খুন-খারাপি বিভাগ’টা কি ‘হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের’ বঙ্গিকরণ?

বাসু বলেন, কী জানি বাপু। ঠিক মতো বঙ্গিকরণ হল কি না তা ওই কাঁটা-সিরিজ লেখক এঞ্জিনিয়ার সাহিত্যিক বলতে পারে। কিন্তু তোমার মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার অনুসন্ধান কার্য অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছে।

—তা বেশ কিছুটা সফলতা লাভ করা গেছে, স্যার। সে সব বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন এ দুদিনে আপনার তরফে কিছু খবর জমেছে?

—জমেছে! এ দুদিনে হাফ-এ বটল শিভাস্ রিগ্যাল খতম হয়েছে। বেশ কয়েক পাউচ তামাকও খোঁয়া হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আমি তো ঘর ছেড়ে আদৌ বরু হইনি। তবে চিন্তাভাবনা করেছি। একটা সলুশানের দিকে কিছু ইঙ্গিতও পেয়েছি।

ইতিমধ্যে বিশ একটা ট্রেতে খাবার আর এক পেয়ালা কফি এনে নামিয়ে দিয়েছে নিখিলের সামনে। কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে নিখিল বললে, বেশ, তাহলে আমার সংগৃহীত তথ্যগুলিই শুনুন।

বাসু হাতটা তুলে ওকে থামতে বলেন, আরে অত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? কফিটা শেষ কর। আমিই দেখি তোমার সংগৃহীত তথ্যগুলো গ্যেস করতে পারি কি না।

—আপনিই আন্দাজ করবেন? অল রাইট। করুন।

বাসু একটু চিন্তা করে বলেন, আমার মন বলছে—এক নম্বর, তুমি ওই মার্ডার ওয়েপানটা খুঁজে পেয়েছ। ছোরাটা। তাতে রক্তের দাগ কালো হয়ে গেছে। হোক কালো, তা কিন্তু হিউম্যান ব্লাড! অ্যাম আই রাইট?

কফির কাপটা নিখিল ধীরে ধীরে টেবিলে নামিয়ে রাখল। তার চোখে বিস্ময়। সে কিছু বলতে যেতেই বাসু বাধা দিয়ে বলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও নিখিল। আমার বলা শেষ হয়নি। তুমি সেটা আবিষ্কার করেছ ভদ্রকের পরে এবং যাজপুর কেওনঝাড় রোডের আগে। রেল লাইনের ধারে। তাই না?

সন্মোহিতের মতো বাসুর দিকে তাকিয়ে নিখিল বললো, সাতাশ কিলোমিটার ফ্রম ভদ্রক স্টেশন, কিন্তু...

—আরে দাঁড়াও না বাপু। অত তাড়াহুড়ো কর কেন। বুড়ো মানুষটাকে একটু

ম ফেলতে দেবে না?

ভাল কথা, ভদ্রক স্টেশনে সেই ভেন্ডারটাকে খুঁজে পেয়েছ?

—কিসের ভেন্ডার?

—তা তো বলতে পারব না। চা-কফি, স্ন্যাকস্, মেঠাইওয়ালা অথবা বুক সেলার। সেই যে গো, সেই লোকটা—যে, মিসেস মালহোত্রাকে জানলার ধারে বসে থাকতে দেখেছিল। তাকে তার সওদা বিক্রি করে। তার দেখা পাওনি? তাজ্জব!

নিখিল যেন প্রতিধ্বনি করে, তাজ্জব! আপনি এখানে বসে তা কেমন করে জানলেন?

—ইন মাই যুজুয়াল ওয়ে! মস্তিষ্কের গ্রে-সেলগুলোর সাহায্যে। এবার বল, লোকটা কী বেচেছিল কমলকলিকে? চা, কফি, পাকৌড়া না পুরী তরকারি?

নিখিলের হতভম্ব ভাবটা তখনো কাটেনি। সে শুধু বলল, আজে না, সে লোকটা ইল ম্যাগাজিন-ভেন্ডার। মিসেস মালহোত্রা তার কাছ থেকে একটা ‘ডেবনেয়ার’ আর একটা ‘স্টার ডাস্ট’ ম্যাগাজিন কিনেছিলেন।...

—আর তার হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তোড়ানি তুম্ রাখ্ দো’। অ্যাম আই করেক্ট?

নিখিল কোনো জবাব দিল না। বজ্রাহতের মতো বাসু-সাহেবের দিকে তাকিয়ে হানুর মতো বসে থাকে।

—কী হল? নিখিল?

সম্মিত ফিরে পায় নিখিল। বলে, স্প্রেভিড! আপনি কী করে জানলেন?

সুজাতা ঝুঁকে পড়ে নিখিলকে প্রশ্ন করে, কী নিখিলদা? ভেন্ডারটা আপনাকে তাই বলেছিল? মিসেস মালহোত্রা তাই বলেছিল ভেন্ডারটাকে? ‘তোড়ানি তোম রাখ দো?’ একটিমাত্র শব্দে স্বীকার করল ইম্পেস্টার নিখিল দাশ : ভাবাটিম!

সম্পূর্ণরূপে একসঙ্গে আক্রমণ করে বাসু-সাহেবকে, বলুন? কেমন করে এখানে বসে এই ম্যাজিক দেখালেন?

বাসু মুচুকি হেসে কৌশিকের দিকে ফিরে বললেন, এসব তো এলিমেন্টারি, না কে বল ভাঞ্জে? চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি পরা একটি ভদ্রমহিলা এছাড়া আর কী বলতে পারেন?

ওরা কেউ কিছু বলতে পারে না।

রানু হাসতে হাসতে বলেন, নিখিল তোমার কফিটা একেবারে জুড়িয়ে যাচ্ছে যে? নিখিল এদিকে ফিরে বলে, কী করব মামিমা? একপেট ঘোল খাবার পর কফি কে খাওয়া যায়?

বাসু প্রশ্ন করেন, পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট কি পাওয়া গেছে? ডাক্তার কি বলতে পারছেন খুনটা কখন হয়েছে?

নিখিল বলে, বলব না! কেন? সেটাও আপনি মন্তব্যে জানতে পারেননি?

—একেবারে যে কোন আন্দাজ করতে পারিনি তা নয়! পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট অনুযায়ী মৃত্যুর সময় বেলা চারটে থেকে ছয়টা। মানে সায়েন্টিফিকালি তাই হবার কথা। সেফসাইডে থাকবার জন্য অটোপ্সিসার্জেন হয়তো চারটের বদলে বলেছেন তিনটে থেকে ছয়টা! মিলল সময়টা?

নিখিল জবাব দিল না। নিঃশব্দে খাবারের প্লেটটা টেনে নিয়ে আহারে মন দিল। সুজাতা তাগাদা দেয়, কী হল নিখিলদা? পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট অনুযায়ী সময়টা তাই?

নিখিল অমলেট চিবাতে চিবাতে বললে, স্যার শুধু ঘোল খাইয়েই আমাকে রেহাই দিলেন না। মাথায় গাধার টুপিটাও পরিয়ে ছাড়লেন। আশ্চর্য! কী করে হয়?

কৌশিক শুধু বললে, কী? ফোর টু সিক্স? না থ্রি টু সিক্স?

তার দিকে তাকিয়ে নিখিল বললে, বেলা সাড়ে তিনটে থেকে ছয়টা! মির্যাকুলাস!

কৌশিক এদিকে ফিরে কী বলতে গেল। শুধু ‘মামু’ বলামাত্রই তিনি বলে ওঠেন, কী আশ্চর্য! এতে অবাক হবার কী আছে? ভদ্রক স্টেশনে কমলকলি জীবিতা ছিল। কারণ স্টেশন-ভেতর তাকে দেখেছে। রেলের খতিয়ান অনুযায়ী ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস তখনো অন-ডুট চলেছে। তাহলে বেলা চারটে দশ পর্যন্ত কমলকলি জীবিত ছিল! কেমন? এটা ফ্যাক্ট! প্রুভড? এদিকে জগদ্বন্ধু পট্টনায়ক যখন ‘সি’-টাইপ কম্পার্টমেন্টে কুলি নিয়ে ঢোকে তখনো ট্রেন রাইট টাইম। তখন সন্ধ্যা ছয়টা সতের আঠারো। কারণ ছটা পনেরয় ট্রেনটা ইন করেছে। তার আগেই কমলকলি মারা গেছে। এই প্লেয়ারিং এভিডেন্স হাতে থাকাতে পোস্ট মর্টাম রিপোর্টে তোমরা কী আশা করেছিলে? ডাক্তার বলবে—সকাল দশটা থেকে রাত আটটা?

নিখিল বলে, না স্যার। আপনার যুক্তিটা দাঁড়াচ্ছে না। যে ডাক্তার পোস্ট মর্টেম করেছেন তিনি আদৌ জানেন না, যে, ভদ্রক স্টেশনে একজন ভেতর মিসেস মালহোত্রাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে। সেটা আপনি-আমি জানি। তিনি জানেন না।

বাসু বলেন, বটেই তো! ডাক্তারবাবু শবাবচ্ছেদ করে তো বিজ্ঞানসম্মত পথেই ‘সত্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছবেন। তাই তিনি এসেছেন। আমরা জানি, মৃত্যুর সময় চারটে দশ থেকে ছয়টা-সতের ভিতর—ফ্রম আদার এভিডেন্স। ডাক্তারবাবু একই সত্যে উপনীত হয়েছেন নিহত মহিলার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে ডাক্তারী বিজ্ঞানে।

নিখিল এ তথ্যটা মেনে নিল। সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। ছোরাটা ঠিক কোথায় পাওয়া গেল অথবা ভেস্তারের সঙ্গে কমলকলির কথোপকথনের বিষয়ে সে আর ফিরে গেল না। বললে, বেশ বোঝা যাচ্ছে খুনটা হয়েছে ট্রেনটা ভদ্রক ছাড়ার ঠিক পরেই। শুধু পোস্ট-মর্টাম রিপোর্ট নয়, মর্ডার ওয়েপনটার অবস্থানও সে কথা এস্ট্যাবলিশ করছে! অলমোস্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট চান্স, লোকটা নেমে যায় যাজপুর কেওনঝাড় স্টেশনে—বিকাল চারটে পঞ্চাশে। আমরা সে স্টেশনেও খোঁজ করেছি। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। কী বলবে? লোকটা নিশ্চয় রক্তমাখা অবস্থায় ট্রেন থেকে নামেনি। হয়তো তার গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো ছিল—রক্তের দাগ যদি তাতে লেগে থাকে তবে তা ঝোলার ভিতর নিয়ে সে টুক করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে।

কৌশিক বলে, তার মানে লোকটা যাজপুর কেওনঝাড় রোড থেকে ডাউন ট্রেন ধরে ফিরে আসে?

—যদি অ্যাট অল কলকাতায় ফিরতে চায়। চাক বা না চাক বর্তমানে যে ভারতবর্ষের প্রায় একশ কোটি লোকের মধ্যে এখন অচিহ্নিত একজন!

তারপর একটা নোটবই দেখে দেখে বলেন, লোকটা যখন যাজপুর নামে সেই সময় ডাউন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল বৈদ্যনাথদাম এক্সপ্রেস। পুরী থেকে পাটনা যাচ্ছিল, খড়াপুর হয়ে। সম্ভবত সে তাতেই চড়ে বসে—তাড়াতাড়ি যাজপুর স্টেশন ত্যাগ করার প্রেরণায়। মৃতদেহটা তো যে-কোন মুহূর্তে আবিষ্কৃত হতে পারে। তারপর ঘন্টাখানেকের মধ্যে দু-দুটো লোকাল ডাউন ট্রেন পাস করে। সম্ভ্য সাতটার কাছাকাছি এসে পড়ে তিরুপতি-হাওড়া এক্সপ্রেস। অবশ্য ইস্ট-কোস্ট যাজপুর স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার পর লোকটার আর কোনো তাড়াহুড়া ছিল না।

সুজাতা বলে, কেন থাকবে না? সে তো শুধু একটা রক্তমাখা চাদরই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল না, তার কাছে ছিল দশ লাখ টাকার অর্নামেন্টস।

নিখিল বলে, তা বটে!

নয়

দুপুরবেলা মধ্যাহ্ন আহারের আসরে এল একটা টেলিফোন। বিশেষ শুনে নিয়ে কর্ডলেস ফোনটা বাড়িয়ে ধরল বাসু-সাহেবের দিকে বললে, আপনের। ধরেন। নাম বুলছে না।

বাসু-সাহেব ছুরি ফর্ক প্লেটে নামিয়ে রেখে 'নিস্তার' টেলিফোনটা নিয়ে তার এক বস্ত্রে দুটি কাঁটা—4

‘কথামুখে’ শুধু বললেন, বাসু—?

ও-প্রান্তবাসী বলে, আপনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছি, স্যার, খুব জরুরি ব্যাপারে। আপনার চেয়ারে গিয়েই বলব। কখন আপনার সময় হবে বলুন?

—আপনার নাম? পরিচয়?

—সেটা সাক্ষাতেই বলব, স্যার। টেলিফোনে নয়।

—কেন? সেই যাঁরা ছুঁলে ছত্রিশ ঘা হয়, তেনারা কি আপনাকে খুঁজছেন?

—ঠিক তা নয়। তবে প্রায় সেই বকমই। একটা দুর্ঘটনায় মৃত...

—দুর্ঘটনায়! আর যু শিয়োর? রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্ট?

—ঠিক তাও নয়। তবে ঘটনাটা রেলগাড়ির কামরার ভিতরেই—

—বুঝেছি। সেই যাকে বলে—‘রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনদিন...’

—আজ্ঞে?

—শুনুন মিস্টার মালহোত্রা, আপনি যদি আমাকে লিগ্যাল কাউন্সেলার হিসেবে রিটেইন করতে চান, তাহলে প্লিজ ডেন্ট কাম! আয়াম অলরেডি বুকড ফর দ্যা কেস।

—আই নো দ্যাট, স্যার। তা জেনেই আপনার সাক্ষাত চাইছি।

—এখন একটা কুড়ি। আপনি তিনটেয় আসতে পারবেন?

—পারব স্যার। আপনি দুপুরে...মানে, বিশ্রাম করেন না?

—করি। আপনারা অনুমতি দিলে। সো কাম অ্যাট থ্রি—লাইনটা কেটে দিলেন।

বাসু বলেন, রূপেশ মালহোত্রা? সে আবার কী চায়?

—সম্ভবত মোলাসেস্! আখের গুড়!

—আখের গুড়! তার মানে?

—‘আখের’ গুছিয়ে নিতে যা প্রদেয়। ‘মধ্বাভাবে’! চাইছিল আমাকে রিটেইন কবোঁ। যখন * নল যে সে-‘মোল্যাসেস্-এ স্যান্ড’ তখন চাইছে প্রমাণ করতে ভাজা মাছের সে একটা পিঠাই চেনে—ও পিঠটা ওর অচেনা!

কৌশিক বলে, সল্টলেক থেকে বলছিল। তাই না?

—কী জানি। জিজ্ঞেস করিনি। পুরীতে সৎকার করেছে পথের কাঁটাটাকে। সম্ভবত এখন প্রথামত পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে চায়। দ্বিতীয়ত ধর্মপত্নীর উইলের প্রবেট।

রানু বলেন, ওভাবে বলছ কেন? হয়তো রূপেশ সম্পূর্ণ নির্দোষ!

বাসু বলেন, হতে পারে। কিন্তু ও যেভাবে টেলিফোনে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে এটা অ্যাকসিডেন্ট!...

—তা নয়। টেলিফোনে হয়তো ও ‘মার্ডার’ শব্দটা ব্যবহার করতে চাইছিল না।

বাসু বললেন, তাও হতে পারে। তাই সে আমাকে ‘ডায়াল এম’ করছিল।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় তিনটের সময় এল রূপেশ মালহোত্রা। বয়স চল্লিশের সামান্য কম বলেই মনে হয়। দীর্ঘ একহারা চেহারা মাথায় ব্র্যাকব্রাশ চুল। এখনো পাকতে শুরু করেনি। গোঁফ-দাড়ি কামানো। পরনে সাফারি সুট।

বিশে তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালো। বাসু ভিতরের দরজা দিয়ে চেম্বারে এসে বসলেন। তাঁর নির্দেশে বিশে ওঁকে এঘরে নিয়ে এল। বাসু বললেন, প্লিজ সিট ডাউন। বলুন এবার কী বলতে এসেছেন?

—আপনি আমাকে ‘তুমিই’ বলবেন, স্যার!

—অলরাইট। বল রূপেশ, কী বলতে চাও!

—আমি আজ জগন্নাথ এক্সপ্রেসে ফিরে এসেছি। এসেই শুনলাম, আপনাকে মিস্টার দস্তুর এনগেজ করে ফেলেছেন, না হলে...

—আই নো, আই নো! কিন্তু তোমাকে কি পুলিশে সন্দেহ করছে? এমন আশঙ্কা করার পিছনে কোনও যুক্তি আছে?

—আপনি তা ভালভাবেই জানেন, স্যার। কমলকলির মৃত্যুতে আনফরচুনেটলি আমিই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছি...

বাসু ঝুঁকে পড়ে বললেন, ‘অ্যাডভার্সিটি বেজায়গায় বসল না?’

—আজ্ঞে?

—তুমি বোধহয় বলতে চাইছ, ‘কমলকলির আনফরচুনেট মৃত্যুতে তুমিই সবচেয়ে লাভবান হচ্ছ’—তাই না?

—দুটোই সত্যি, স্যার! তাই পুলিশের চোখে আমি প্রাইম সাসপেক্ট। এ হত্যারহস্যে ডিফেন্স কাউন্সেল হিসাবে আমার প্রয়োজনটাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

বাসু আবার হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, আর যু শ্যিঙের? তোমার শ্বশুরের একান্ত সচিব পামেলা কাত্রোচ্চির নয়?

রূপেশ মুখ তুলে ওঁর চোখে চোখে তাকালো। পাঁচ সাত সেকেন্ড দেরি হল জবাবটা দিতে। তারপর অস্ফুটে বলল, আই ডোন্ট নো, স্যার।

—বাট যু ক্যান ভেরি ওয়েল গ্যোন্স! কান্ট যু?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমিও ভেবে দেখেছি। জে. ডি. সাহেব এবার হয়তো তাঁর মতটা বদলাবেন। হয়তো এখনই নয়, আগাতটা সামলে ওঠার পর।

—‘মত’ আর ‘পথ’টা বদল নাও করতে পারেন; কিন্তু উইলটা তাঁকে পালটাতেই হবে। নতুন ওয়ারিশ তাঁকে খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে

চাইলে কেন? তুমি তো জানই, এ-‘কেস’-এ তোমাকে ক্লায়েন্ট হিসেবে মেনে নিতে পারব না।

রূপেশ মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর মুখ তুলে বললে, উড যু মাইন্ড, স্যার, ইফ আই স্মোক?

—সার্টেনলি নট! ফীল কামফার্টেবল!

রূপেশ পকেট থেকে ইন্ডিয়াকিং সিগ্রেটের কার্টন বার করে একটা ধরালো তার লাইটারে। বললে, আপনি আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানেন না—আমি রেস খেলে বহু টাকা উড়িয়েছি, স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনাও হয়নি, আমরা ‘সেপারেশনে’ ছিলাম, এসব প্রাথমিক তথ্যগুলি ছাড়া আপনি আর কিছুই বিশেষ জানেন না। আমি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ‘থরলি’ ওয়াকিবহাল। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, মক্কেলকে বাঁচাতে আপনি কায়দা করে কোনও নিরপরাধীকে ফাঁসির দড়ির দিকে ঠেলে দেবেন না। সেটা আপনার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ হবে। তাই আমি চাই : আপনি ‘কেসটা সল্ভ করুন। আমি জানতে চাই—কে আমার স্ত্রীকে ট্রেনের কামরায় খুন করেছে। আমি জানতে চাই : কে আমার স্ত্রীকে প্রেমপত্র লিখে প্রলুব্ধ করত।...

বাসু কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলেন, তার মানে? কমলকলিকে যে একজন প্রেমপত্র লিখত এ তথ্যটা তুমি আন্দাজ করলে কী করে?

—আন্দাজ নয়, স্যার। কংক্রিট প্রমাণ! ডকুমেন্টারি প্রুফ। সেগুলিই আপনার কাছে জমা দিতে এসেছি।

—অলরাইট। প্রসীড। কিন্তু সবার আগে বল, ঘটনার দিন—ওই উনত্রিশ তারিখ দুপুরে তুমি নিজে কোথায় ছিলে?

রূপেশ তৎক্ষণাৎ বলল, এ প্রশ্নটা কি প্রাসঙ্গিক, স্যার? অ্যাট-অল রেলিভেন্ট?

—নয়? হত্যামুহূর্তে তুমি কোথায় ছিলে এটা তো একটা মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সেটাই তোমার ‘অ্যালোবাই’।

—না, স্যার। সেটা পুলিশের মতে। আপনার তদন্ত অনুসারে নয়।

—কেন নয়?

—আপনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান! আপনি ভালভাবেই জানেন : রূপেশ মালহোত্রা যদি মূল আসামী হয়, তবে সে নিজে হাতে খুনটা করবে না। কারণ রূপেশ মালহোত্রার কাছে আট দশ লাখটাকার গহনা কিছুই নয়। তার স্থির লক্ষ্য : কমলকলির উইলবর্ণিত শেষপৃষ্ঠার : ‘শিডিউল অব প্রপার্টিজ’! যার মূল্যমান কয়েক কোটি টাকা। ফলে, রূপেশ মালহোত্রা যদি এ অপরাধের শীর্ষবিন্দুতে থাকে তবে সে প্রফেশনাল মার্ভারার নিয়োগ করবে। হত্যা মুহূর্তে থাকবে হত্যাশ্রল থেকে বহু বহু দূরে। পাক্কা ‘অ্যালোবাই’

থাকবে তার। তাই নয়, স্যার?

বাসু বললেন, এ তো তোমার অ্যানালিসিস্। আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলে না!
উনত্রিশ দুপুরে তুমি বাস্তবে ছিলে কোথায়?

রূপেশ কিছুদ্ধ নীরব রইল। মাথা নিচু করে। তারপর হঠাৎ বাসু-সাহেবের
চোখে চোখে তাকিয়ে বলল, এ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা কি আপনার উচিত হচ্ছে, স্যার?

বাসু বললেন, অলরাইট বল না তাহলে।

—ভেবে দেখুন, স্যার। আমি আপনার মক্কেল নই। আমি যা বলছি, যা বলব,
তা কোনও ‘প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন’ নয়। মামলা আদালতে উঠলে আপনাকে
প্রসিকিউশনের প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, আমি কী কী বলেছি। হত্যাযজ্ঞে আমি
কোথায় ছিলাম সে কথাও। আমি জানি, পুলিশ ইতিমধ্যে আমার বাড়িতে গিয়ে
খোঁজ-খবর নিয়েছে। তারা জানে, ঘটনার দিন ভোরবেলা আমি বাড়ি থেকে চলে
যাই। ফিরে আসি রাত এগারোটায়। পুলিশ আশ্রয় চেষ্টা করছে জানতে আমি ওই
দুপুরে কোথায় ছিলাম। আমার কোনও পাক্সা ‘আলেবাই’ আছে কি না। তাই নয়?

—অলরাইট! বোল না সে কথা। ঠিকই বলেছ তুমি। যেসব কথা তুমি এখন
বলছ তা কোনো ‘প্রিভিলেজড কম্যুনিকেশন’ নয়। প্রয়োজনে তা আমাকে বলতে
হবে পুলিশকে। সুতরাং ও প্রশ্ন থাক।

—না, স্যার! থাকবে না। সব জেনেবুঝেও আমি তা আপনাকে জানাব। আমি
বিশ্বাস করব : আপনি তথ্যগুলি অযাচিতভাবে পুলিশকে জানাবেন না। প্রসিকিউশন
যদি আপনাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলে তখন আপনি বলতে বাধ্য হবেন। সেটা
জানি। তবু আমি বলব, ওই দিন ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি
কোথায় ছিলাম।

বাসু এবার নিজে থেকেই বাধা দিয়ে বলেন, থাক না? কী দরকার?

—দরকার আছে, স্যার! সবগুলো অ্যাভেইলেবল্ ডাটা আপনার হাতে পৌঁছানো
দরকার। যাতে পর্যায়ক্রমে আপনি এ বিচিত্র সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে
পারেন। আমি ঘটনার দিন ভোরবেলা বাড়ি থেকে বার হয়ে যাই। বেলা নয়টা পর্যন্ত
কোথায় ছিলাম, কী করেছিলাম, তা আমি এখন বলছি না। তারপর আমি হাওড়া
স্টেশনে চলে যাই, শুধুমাত্র একটা স্যুটকেস নিয়ে। ফর য়োর ইনফরমেশন, স্যার
আমি ওই ইস্ট কোর্স এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরে বালাসোর চলে যাই। আনরিসার্ভড
সেকেন্ড ক্লাসে। আমি ওই ট্রেনেই ছিলাম।

রূপেশ যেন এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চুপ করে
গেল একেবারে।

বাসু অবাক হলেন কি না, বোঝা গেল না। শান্তস্বরে প্রশ্ন করলেন, কেন রূপেশ ওই ট্রেনে তুমি বালাসোর গেলে কেন?

রূপেশ বলে, আমারও নিমন্ত্রণ ছিল সেই ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারিতে প্রকাশ দস্তুর—মানে যার ম্যারেজ-অ্যানিভার্সারি ছিল—সে আমাকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ করেছিল। সামাজিক দৃষ্টিতে কমলকলির স্বামী আমি। প্রকাশ জানে যে, আমাদের সেপারেশন চলছে। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও হয়েছিল আমাদের বিয়ের পরে। ফলে, সে আমাকেও সল্টলেকের ঠিকানায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠায়। সম্ভবত সে আন্তরিকভাবে চাইছিল যাতে আমাদের দুজনের মনোমালিন্যের অবসান হয় কলি বা জে.ডি জানতেন না আমার নিমন্ত্রিত হবার কথা। গত মাস-ছয়েক আমি লাউডন স্ট্রিটে দস্তুর প্যালেসে যাইনি। ভেবেছিলাম, বালাসোরে কলিকে কয়েকট কথা বলব। সে জনাই ওই সুযোগটা নিই। আমার ধারণা ছিল, ওঁরা দুজন ফার্স্ট ক্লাস ‘কুপে’তে যাচ্ছেন। তাই ভেবেছিলাম, বালেশ্বর স্টেশনে ওঁদের মীট করব। ট্রেনট যখন বালাসোর স্টেশনে ‘স্টন’ করল তখন আমার কামরাটা পড়েছিল ঠিক এক্সিট ডোরের সামনে। আমি চট করে নেমে প্রস্থান পথের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখতে পাই, প্রকাশ নিজেই এসেছে ওঁদের রিসিভ করতে। সে ছোট্টছুটি করছে প্ল্যাটফর্মে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলোয় সে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। জে. ডি ব কমলকলির দেখা পেল না। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। প্রকাশ হতাশ হয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমি সবটাই দেখলাম। আত্মপ্রকাশ করলাম না।

বাসু জানতে চাইলেন, কেন?

—বেশ বুঝতে পারলাম, যেকোন কারণেই হোক ওঁরা এ ট্রেনে আসেননি। আমি কলকাতায় ফিরে আসতে চাইলাম। ইনফ্যাক্ট, পরের একটা প্যাসেঞ্জার ধরে আমি খড়গপুরে চলে আসি। সেখান থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে কলকাতায়। হাওড়া থেকে আমি দস্তুর প্যালেসে ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেছিল কোনও একজন বেয়ারা সে জানালো, জে. ডি. বাড়িতে নেই আর কলি বালাসোরে চলে গেছে। ওই সকালের ট্রেনেই। আমি তাকে নিজের পরিচয় দিইনি।

—বুঝলাম। কিন্তু প্রকাশের কাছে কেন তুমি আত্মপ্রকাশ করলে না?

—সহজবোধ্য হেতুতে। দেখতে পেলে সে আমাকে ওঁদের বাড়িতে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। যেটা আমি অ্যাভয়েড করতে চাইছিলাম। কলির সঙ্গে দেখা করতেই আমি বালাসোরে গিয়েছিলাম। পার্টিতে যোগ দিতে নয়।

বাসু জানতে চান, তুমি কি তার আগেই জানতে যে, কমলকলিকে কেউ প্রেমপত্র লেখে বা তার সঙ্গে কারও একটা অবৈধ প্রণয়ের পর্যায চলছিল?

—না, স্যার। সে কথা তখন আমি জানতাম না।

—তাহলে কখন জানলে এবং কেমন করে জানলে?

রূপেশ ব্যাখ্যা দেয়। কমলকলির মৃত্যু সংবাদ সে তার মোবাইল ফোনেই পেয়েছিল। পরদিন সে গাড়ি নিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে যায়। যাবার আগে জে.ডি. কে একটা ফোন করে। তাঁকে ফোনে ধরতে পারে না। তিনি বাড়ি ছিলেন না। তবে পামেলার সঙ্গে তার ফোনে কথা হয়। জানতে পারে যে, মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা ও বাড়িতে সকলেই জানে। রূপেশ পামেলাকে জানায় যে, সে গাড়ি নিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে যাচ্ছে দেহটা শনাক্ত করতে। সংবাদটা যেন জে. ডি. কে জানানো হয়।

রূপেশ বলে, আপনাকে স্যার আমি দুটি তথ্য দেব। যে কথা আপনাকে মিস্টার নিখিল দাশ জানাতে পারেননি। ইন ফ্যাক্ট, তা তিনি নিজেও জানেন না। আপনিও না। আমি আপনার মক্কেল নই। তবু এ দুটি তথ্য আপনাকে সরবরাহ করছি গোপনে। আমি চাই না, আপনি অপ্রয়োজনে তা জে. ডি বা পুলিশকে জানান।

—কী তথ্য?

—আপনি সেটা গোপন রাখবেন তো? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?

বাসু বললেন, লুক হিয়ার ইয়াংম্যান! এটা একটা মার্ডার কেস। কোনো এভিডেন্স—যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে—তা আমি জেনে গোপন রাখতে পারি না। আজ অ্যান অফিসাব অব দ্য হাইকোর্ট! তুমি আমাকে ওসব কথা তাহলে বোল না।

—না, স্যার! আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমি যে তথ্যগুলি দিচ্ছি তা জে. ডি. জানেন না। ক্যালকাটা পুলিশের নিখিল দাশও জানেন না। কিন্তু উড়িষ্যা পুলিশ জানে। ইন ফ্যাক্ট, আমি তা জেনেছি এস. আর. পি. ভুবনেশ্বরের কাছে থেকে।

—যু মিন সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব রেলওয়ে পুলিশ, ভুবনেশ্বর?

—ইয়েস স্যার! তিনিই আমার মোবাইল ফোনে আমাকে দুঃসংবাদটা জানান। তাঁর উপস্থিতিতেই আমি মর্গে গিয়ে মৃতদেহ শনাক্ত করি। তাঁর কাছ থেকে এ দুটি গোপন তথ্য আমি জেনেছি। প্রয়োজনে আপনি তাঁকে এস. টি. ডি করে জেনে নিতে পারেন আমি সত্যকথা বলছি কি না।

—তিনি জানেন, অথচ নিখিল দাশ জানে না? হাউ কাম?

—আমিই তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তথ্য দুটি মৃতামহিলার স্বার্থে গোপন রাখতে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ক্যালকাটা পুলিশ চলে পার্টির নির্দেশে। আর পার্টি চলে বিজনেস্ ম্যাগনেটদের নির্দেশে। ফলে, তথ্য দুটি গোপন থাকবে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাবেই। তাতে লাভ হবে না কারও। শুধু শুধু একটি মৃত মহিলার কেচ্ছাকাহিনীতে খবরের কাগজ মজা লুটবে। দুর্ভাগিনীর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে

যাবার আগেই এই মুখরোচক কেচ্ছাটা মুখে মুখে ফিরবে।

বাসু জানতে চান, এস. আর. পি, ভুবনেশ্বর রাজি হলেন?

—হলেন। বললেন, মৃতা মহিলাটি বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও মৃতদেহটা আবিস্কৃত হয়েছে উড়িষ্যা। এক্ষেত্রে কেসটা উড়িষ্যা হাইকোর্টের এজিয়ারভুক্ত। তিনি তাঁর রিপোর্টে তথ্য দুটি গোপন রাখবেন না ; কিন্তু আমার অনুরোধে ক্যালকাটা পুলিশকেও অযাচিত জানাবেন না।

—আই সি। তথ্য দুটি কী?

—কলির হ্যাণ্ডব্যাগে একটা ছোট্ট নোট বই ছিল। টেলিফোন নম্বরের রেডি-রেকর্ডনার। তাতেই আমার মোবাইল নম্বরটা এস. আর. পি. খুঁজে পান ও আমাকে ফোন করেন। উনি আমাকে সেটি দেখান। আমি সেটা পকেটে পোরার উপক্রম করতেই ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, “নো, নো, স্যার! ওটা এভিডেন্স! আপনাকে দেখতে দিয়েছিলাম শুধু। প্রত্যর্পণ করছি না।” তখন আমি বললাম, “এই খাতায় আমার স্ত্রীর অনেক বান্ধবীর নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আছে। যা আমার জানা নেই। অথচ কলির শ্রাদ্ধে তাঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। আমি কি নাম ঠিকানাগুলি টুকে নিতে পারি?” উনি তাতে আপত্তি করলেন না। আমি গোটা পঞ্চাশ নামের তালিকা বানিয়ে ফেললাম। নোট বইটা ফেরত দিলাম। এই নিন স্যার, সেই লিস্টের একটা জেরক্স কপি।

বাসু তালিকাটি হাত বাড়িয়ে নিলেন। টেবিলের উপর কাগজচাপার তলায় রাখলেন। বললেন, দ্বিতীয়টা?

রূপেশ সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, ওই লিস্টের প্রথম পাতাতেই একটা মুসলমানের নাম দেখতে পাচ্ছেন : ‘আলী’? লোকটাকে আমি চিনি না। তবে সেটা কিছু অবাক করা খবর নয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবীকেও কলি চিনতো না। কিন্তু আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, স্যার ওই এন্ট্রিটি বেশ কিছু মিস্টিরিয়াস! তাই নয়?

বাসু জবাব দিলেন না। কাগজটা তুলে নজর করলেন। প্রথম দিকেই ‘A’-এন্ট্রিতে লেখা আছে “Ali 0119734270”।

—কী মনে হয় স্যার? ‘আলী’ নামের কোনো ভদ্রলোকের মোবাইল নম্বর?

—হতে পারে। অথবা নিউ দিল্লির কোনো টেলিফোন নম্বরও হতে পারে, কারণ দিল্লির জোনাল কোড নম্বর ‘011’—হয়তো বাকি সাতটা নম্বর আলীসাহেবের টেলিফোনের।

রূপেশ বলল, আমারও তাই আন্দাজ হয়েছিল। তাই আজ খুব সকালেই ওই নম্বরে একটা এস. টি. ডি করেছিলাম। জবাব পেলাম : এ নম্বরটায় কেউ থাকে না।

দ্য নম্বর ডাজ'ন্ট এগ্জিস্ট!

বাসু বলেন, বুঝলাম। কিন্তু এতে মিস্ট্রির কী দেখলে? হয়তো অনেক পুরানো নম্বর। আলী এ নম্বর ছেড়ে দিয়ে গেছে!

—না, স্যার। ‘আলী’ নয়। লোকটা মুসলমানই নয়। হিন্দু। ওব ছদ্মনাম ‘অলি’।

—কী করে জানলে?

রাপেশ নিঃশব্দে তার পকেট থেকে বার করে দিল একটা খাম। ইতিপূর্বে দৃষ্ট একই হস্তাক্ষরে লেখা ছোট্ট চিঠি :

কলি, আমার কলি,

প্লীজ, বালাসোরে তুমি যেও না। একেবারে শেষমুহূর্তে হঠাৎ (ভগবান না করুন) তোমার স্টম্যাক আপসেট তো হতেই পারে। পারে না? জে. ডি তখন একাই যেতে বাধ্য হবেন। তিনি রওনা হয়ে গেলেই আমাকে হোটেলে ফোন কর। বাদবাকি আমার দায়িত্ব।...সকাল থেকে তোমাকে দুবার ফোন করি। প্রথমবার ধরেন জে. ডি স্বয়ং। তৎক্ষণাৎ লাইন কেটে দিই। দ্বিতীয়বার টেলিফোন ধরে তোমার সেই ভেটকিমুখো কম্পানিয়ান—কী যেন নাম, ভুলে গেছি। আমি যতবার জানতে চাই, ‘মিসেস মালহোত্রা আছেন?’ ততবারই সে ডবাব দেয়, ‘আপনি কে বলছেন?’ বোঝ সেই ভেটকিমুখোর অবস্টিনেন্স! আমি কি বলব যে, আমি তাঁর মালকিন কমলকলির চারপাশে ঘুরঘুর করা মুঞ্চ ভ্রমর? আমি টেলিফোন কবতে পারছি না। তুমি কব। কেমন?

পাঠান্তে বাসু বললেন, এটা তো জেরক্স কপি। মূল কাগজখানা কি ছিল গোলাপী রঙের? আর কালীটা নীল?

রাপেশ অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

বাসু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করেন, আর নোট বইয়ে আলীর ওই নাম নম্বরটা? সেটা কি ছিল একই কালিতে লেখা?

রাপেশ স্বীকার করল তা ওর মনে নেই। সে লক্ষ্য করে দেখেনি।

বাসু জানতে চান, বালাসোর স্টেশনে তুমি সোমা হাজরাকে দেখতে পাওনি? মানে, কলির সেই ভেটকিমুখী কম্পানিয়ানকে?

—আপ্তে না! আমি অন্য কোনো যাত্রীর দিকে নজরই করিনি। স্টেশনে বেশ ভিড়ও ছিল। আমি প্রকাশকে নজরে রেখেছিলাম। জে. ডি. আর কমলকলিকেই খুঁজছিলাম।

বাসু জানতে চান, এই মুঞ্চভ্রমর ‘অলি’টি কে তা আন্দাজ করতে পার?

জবাটো দিতে একটু দেরি হল রূপেশের। গুছিয়ে নিয়ে বলল, একটি মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে কথাটা বলা বোধহয় শোভন হচ্ছে না। বাট ইট্‌স্‌ এ মার্ডার কেস! আপনাকে সব কথাই বলা উচিত। দেখুন, কলি কিছু ধোওয়া তুলসীপাতাটি ছিল না। প্রাকবিবাহ জীবনে তার একাধিক প্রেমিক ছিল। সুতরাং ‘অলি’ যে কে তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না—

—নিশ্চিত করে তো বলতে বলছি না। এনি ওয়াইল্ড গ্যেস্‌?

—হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আমার সন্দেহ লোকটার নাম বিক্রমজিৎ সিং। আমাদের বিয়ের আগে বেশ কিছুদিন কলি ওই বিক্রমজিতের সঙ্গে স্টেডি ডেটিং করছিল। তারপর জে. ডি.-র ছুড়ো খেয়ে লোকটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। আমাদের বিয়েতে সে নিমন্ত্রিত হয়েছিল কি না জানি না—আমি কলিকে কোনদিন প্রশ্ন করিনি, কিন্তু সে আসেনি। না দিল্লিতে, না পরে কলকাতার তাজবেঙ্গলের পার্টিতে। তবে লোকটা সম্প্রতি আবার ঘুরঘুর করতে শুরু করেছিল। আমাদের সেপারেশনের পর থেকেই। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে সে কলকাতার হোটেল ‘রাতদিনে’ সাতদিন ছিল। উনত্রিশ তারিখে—অর্থাৎ ঘটনাব দিন সকালে আটটা নাগাদ হোটেল থেকে চেক আউট করে কোথাও চলে যায়। কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস না রেখে।

—এ তথ্য তুমি জানলে কেমন করে?

রূপেশের হাসিটা স্নান দেখালো। বললে, আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ফলে, ওর গতিবিধির উপর নজর রাখতে আমি একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে নিযুক্ত করেছিলাম। কলি যদি বেমক্লা খুন হয়ে না যেত তাহলে ডিভোর্স-কেস-এ একটা মানি সেটলমেন্টের প্রশ্ন উঠতই। তখন এসব তথ্য আমার কাজে লাগত।

বাসু বলেন, বুঝলাম। তা তুমি আমার কাছে ঠিক কী চাইছ বল তো?

—আপনি খুঁজে বার করুন! কে, কেন কলিকে এভাবে খুন করল! শুধুই গহনাব লোভে? না কি আরও বড় কোন লাভের আশায়? দ্বিতীয়ত, আমার পরলোকগতা স্ত্রীকে কে ‘সিডিউস্‌’ করছিল?

—আর আমার সমাধান যদি বলে : না! গহনার লোভে কেউ কলিকে খুন করেনি! করেছে আরও কোনও বড়জাতের প্রাপ্তির লোভে? আমার সমাধান যদি বলে : এসব চিঠি জাল! হত্যাকারী এগুলি সৃষ্টি করেছে হত্যাপরোধ ‘অলি’ নামের একজনের স্বন্ধে চাপিয়ে দিতে? সে ক্ষেত্রে?

—কে এমন লোক হতে পারে? একটা সম্ভাব্য নাম বলুন?

বাসু ওর চোখে চোখে তাকিয়ে বলেন : রূপেশ মালহোত্রা!

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল রূপেশ। বললে, গুড বাই স্যার! বেস্ট অব ল্যাক!

দশ

সেদিনই রাত আটটা নাগাদ আবার একটা টেলিফোন এল। জি.ডি.র কাছ থেকে। বাসু-সাহেব আত্মঘোষণা করা মাত্র দস্তুর বললেন, একটা অত্যন্ত গোপন এবং জরুরী সংবাদ জানাতে চাই। আপনাকে কষ্ট দেব না। আমি নিজেই এখনি আপনার বাড়িতে চলে আসতে চাই। আপনি কি আধঘণ্টা সময় দিতে পারবেন?

—অফকোর্স! যু আর ওয়েলকাম।

—মিস্টার কৌশিক মিত্র কি আছেন? তাঁকে কি পাব?

—পাবেন। সে বাড়িতেই আছে।

—আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, এ খবরটা কাউকে জানাবেন না। বিশেষত পুলিশকে।

—এগ্রিড। আসুন আপনি।

আধঘণ্টার মধ্যেই দস্তুর-সাহেবের গাড়ি এসে থামল বাসুসাহেবের বাড়ির পোর্টিকোর সামনে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া তিনি একা। কৌশিক বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। আপ্যায়ন করে নিয়ে এসে বসালো তাঁকে বাসু-সাহেবেব ঘরের সমুখে প্রতীক্ষাগারে। বাসু খবর পেয়ে নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আসুন মিস্টার দস্তুর। এ ঘরে এসে বসুন।

দস্তুর এ ঘরে এসে বসলেন। ড্রিংস কোন কিছু নিতে রাজি হলেন না। জানালেন, পুরীর স্বর্গদ্বারে কমলকলির শেষকৃত্য করে উনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তার পরেই উনি সরাসরি চলে এলেন জরুরি ব্যাপারটায়। ঘণ্টাখানেক আগে—রাত সাতটা নাগাদ উনি বোম্বাই থেকে একটা এস. টি. ডি. কল পান। যিনি ফোন করছিলেন তাঁর নাম আবদুল লতিফ। মুম্বাই ক্রফোড মার্কেটে তাঁর বিরাট সোনারুপার জুয়েলারি শপ এ. বি. জুয়েলার্স। গুঁরা দুজন পার্টনার। আবদুল লতিফ আর বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একজন মুসলমান একজন হিন্দু। একজন মুম্বাইওয়ালা একজন বাঙালী। তবু গুঁদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দস্তুর-সাহেবের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের পরিচয়। ব্যবসায়িক সূত্রে। সেই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র পার্টনার জনাব আবদুল লতিফই ফোন করছিলেন।

বাসু জানতে চান, কী বলতে চান জনাব আবদুল লতিফ?

দস্তুর বলেন, আমার টেলিফোনে একটা গ্যাজেট আছে। বোতাম টিপলেই দুপক্ষের কথা একটা অডিও টেপ-এ রেকর্ড হয়ে যায়। আমি লতিফের ফোন পাওয়ামাত্র বোতামটা টিপে দিয়েছিলাম। আমাদের দুজনের কথাই টেপ-এ ধরা

গেছে। সেটা আমি নিয়েও এসেছি। গাড়িতে আছে...

কৌশিক বলে, ঠিক আছে, আমি সেটা নিয়ে আসছি। তাহলে আপনাদের কথোপকথন ডাইরেক্ট ন্যারেশানে শোনা যাবে।

দস্তুর একটি টু-ইন ওয়ানে টেপটা ভরে নিয়ে এসেছেন। কৌশিক যন্ত্রটা চালিয়ে দিল। প্রথম দিককার কিছুটা কথা রেকর্ডেড হয়নি। সম্ভবত তখনো দস্তুর-সাহেব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি এবং বোতামটাও টিপে দেননি। কথাবার্তা আদ্যন্ত হিন্দিতে। অনুবাদে তা এই রকম :

দস্তুর : আপনি যখন বলছেন তখন পুলিশকে কিছু জানাব না। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

লতিফ : আপনার মেয়ের সম্বন্ধে মর্মান্তিক সংবাদটা কাগজে পড়েছি। আমার গভীর সমবেদনা ইতিপূর্বেই ফ্যাক্স করে জানিয়েছি। সেই সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত গোপন সংবাদ আপনাকে এখন জানাতে চাই। আপনি যদি সম্পূর্ণ গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

দস্তুর : সে কথা তো আগেই বলেছি। বলুন আপনি?

লতিফ : কলি-মার অপহৃত অলঙ্কারের একটি পিস—পাল্লা বসানো নেকলেসটা এখন কোথায়, কার কাছে আছে, আমি জানি।

দস্তুর : আর যু শ্যিওর? ওটা সেই নেকলেসটাই?

লতিফ : দস্তুর সাব! আপনার য্যাদ নেই। নেকলেসটা এই বান্দার কারিগরেই বানিয়েছিল। আমি সেন্ট্রাল লকেটের বড় পাল্লাটি সরিয়ে দেখে নিয়েছি তার নিচে আমাদের কোম্পানির মনোগ্রাম আছে : 'এ.বি'। যার কাছ থেকে নিয়ে দেখেছি, সে তা জানে না। পাল্লা যথাস্থানে সেট করে তাকে ফেরত দিয়েছি। বলেছি, কাল আসতে।

দস্তুর : অল-রাইট। আমি মেনে নিলাম এটা সেই একই নেকলেস। কিন্তু পুলিশের সাহায্য ছাড়া সেটা আমি কী করে উদ্ধার করব?

লতিফ : আপনি নিজে চলে আসুন। মুম্বাইয়ের নেস্টট ফ্লাইটে। কাল রাত নটার সময় লোকটা নেকলেস নিয়ে আমার বাড়িতে আসবে। নগদ টাকায় বেচতে। আমি তাকে হাতে নাতে ধরিয়ে দেব।

দস্তুর : অলরাইট! কিন্তু পুলিশের সাহায্য ছাড়া তাকে আমি ধরব কীভাবে?

লতিফ : পুলিশই ধরবে। মুম্বাইয়ের পুলিশ! আমার চেনা পুলিশ! আপনি শুধু আইডেন্টিফাই করবেন নেকলেসটা।

দস্তুর : বুঝলাম না। আপনি যদি পুলিশেই শেষ পর্যন্ত খবর দেন, তাহলে আমার

পুলিশে খবর দেওয়ায় আপত্তি কী?

লতিফ : সে আলোচনা আমি টেলিফোনে করব না, স্যার। ইনফ্যান্ট্রি, এর সঙ্গে যদি কলি-মার দুর্ঘটনাটা—আপনি নিশ্চয় বুঝছেন, আমি কোন দুর্ঘটনার কথা বলতে চাইছি—জড়িত না থাকত তাহলে আমি হয়তো আপনাকে এতকথা বলতামই না। আপনি কি আসতে পারবেন? কাল রাত নয়টায়? আমার গরিবখানায়?

দস্তুর : না। আমি নিজে যেতে পারব না। কাল আমাকে কলকাতাতে থাকতেই হবে। তবে আমার তরফে একজন প্রতিনিধি যাবেন। নামটা লিখে নিন : মিস্টার কৌশিক মিত্র অব ‘সুকৌশলী’। উনি একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

লতিফ : অলরাইট স্যার। উনি যেন ওঁর পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসেন। আমার দোকানে নয়, বাড়িতে। অ্যাপ্রেন্স তো আপনার জানা? বাস্তার কার্টার রোড...

দস্তুর : হ্যাঁ, অ্যাপ্রেন্স আমার জানা। যদি মিস্টার কৌশিক মিত্র কোন কারণে না যেতে পারেন তাহলে আজ রাট্রেই আমি ফোনে জানাব। সে-ক্ষেত্রে অন্য কেউ যাবে।

লতিফ : থ্যাঙ্কু স্যার। ‘অন্য কেউ’টা যেন পুলিশের লোক না হয়। ওড নাইট! কৌশিক বলল, আমি রাজি। কাল মর্নিং ফ্লাইটেই মুম্বাই চলে যাব। এখন টিকিট পেলে হয়।

দস্তুর বললেন, সে চিন্তা করবেন না। আপনি যেতে পারেন ধরে নিয়ে আমি দুখানি টিকিটের ব্যবস্থা করেছি। ভি. আই. পি কোটায়। আপনি একা যাবেন না। মিস্টার দাশও যাবেন। কিন্তু তিনি আবদুল লতিফের বাড়িতে যাবেন না। মুম্বাই পুলিশ লোকটাকে অ্যারেস্ট করার পর তিনি আত্মঘোষণা করবেন। লতিফকে আমি ওয়ার্ড অব অনার দিয়ে রেখেছি।

বাসু বললেন, নাইন্টি ফাইভ পারসেন্ট চান্স, জনাব আবদুল লতিফ এ জাতীয় চোরাই মাল খরিদ করে থাকেন—আস্তার ওয়ার্ল্ডের কাছে থেকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার প্রতি বন্ধুত্বের খাতিরে, এবং সম্ভবত কমলকলিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন বলেই তিনি এই পদক্ষেপ করেছেন। অথবা হয়তো মার্ডার কেস জানার পর চূপ করে থাকতে তাঁর বিবেকে বেধেছে।

দস্তুর শুধু বললেন, না, ব্যারিস্টার সাহেব। নাইন্টি ফাইভ নয়, ওটা সেন্ট পারসেন্ট। মুম্বাইয়ের যে পুলিশ কর্তার মাধ্যমে তিনি জুয়েল থিফটাকে ধরিয়ে দেবেন তিনি

ওঁর জানা লোক। তিনি এমনভাবে জুয়েল থিফকে ধরবেন যাতে আন্ডার ওয়ার্ল্ড বুঝতে না পারে যে, খবরটা পাচার হয়েছে আবদুল লতিফের মারফত! যা হোক, তাহলে ওই কথাই রইল। মিস্টার মিত্র, আপনি তাহলে মিস্টার দাশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার গাড়ি কাল সকালে আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। টিকিট আমার ড্রাইভারের হাতে থাকবে। ইমপেক্টর দাশ অবশ্য সরাসরি পুলিশের গাড়িতে এয়ারপোর্টে যাবেন! তাহলে চলি?

দস্তুর উঠে দাঁড়ালেন। যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। বাসু ঠিক তখনই পিছন থেকে প্রশ্ন করেন, মিস্ পামেলা কাত্রোচি কি এই নতুন পরিস্থিতির কথাটা জানেন?

দস্তুর দোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ান। একটু দেরি হল জবাবটা দিতে। তাঁর প্রকৃষ্টিত হল। নতনেত্রেই বললেন : নো। গুডনাইট।

এগারো

পরদিন ভোরবেলাকার মুম্বাই ফ্লাইটে রওনা হয়ে গেল ওরা দুজন—নিখিল আর কৌশিক। মুম্বাই এয়ারপোর্টে পৌঁছে নিখিল বললে, মুম্বাইয়ে আমরা একত্রে থাকব না। আমি থাকব আমার এক সহকর্মীর বাড়িতে চার্চ গেটে। রাত সাড়ে আটটায় আমি থাকব বান্দ্রায়। কার্টার রোডে সমুদ্রের ধারে একটা ‘সি ফেয়ারার্স ক্লাব’ আছে। সেখানেই অপেক্ষা করব। সাড়ে আট থেকে সাড়ে নয়। তুমি একাই যাবে জনাব আবদুল লতিফের বাড়িতে। ওঁর বাড়ি থেকে ক্লাবটা ইস্টক-ফ্লেকপণ দূরত্বে। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কর। লোকটা ধরা পড়লে তো নিশ্চয়ই।

কৌশিক রাজি হল। ওরা নির্গমনদ্বার দিয়ে বার হয়ে আসতেই নিখিল বলল, ওই প্ল্যাকার্ডটা দেখ। লোকটা তোমাকেই রিসিভ করতে এসেছে। ওর কাছে এগিয়ে যাও।

যারা প্লেনের যাত্রীদের নিতে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকে বোর্ড উঁচু করে এল।”

কৌশিক তার কাছে এগিয়ে আসতেই লোকটা বললে, গুডমর্নিং, স্যার, যু আর কৌশিক মিত্র? ফ্রম ব্যারিস্টার...

কৌশিক পাদপূরণ করল : পি. কে বি—

—আইয়ে স্যার, মেরা সাথ। সামান?

কৌশিক জানালো তার হাতে যে অ্যাটাচি কেস আছে এছাড়া তার আর কোন মালপত্র নেই। ওরা এগিয়ে এল পার্কিং লটের কাছে। লোকটা সবিনয়ে বলল, বুয়া

না মানিয়ে সা'ব, আপকো ড্রাইভিং লাইসেন্স?

—বুঝা মাননেকা ক্যা সওয়াল? বলতে বলতে কৌশিক তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখিয়ে দিল। গাড়িতে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। ফিয়াট গাড়ি। ঘুরতে ঘুরতে চলে এল বাম্রায়, কার্টার রোডের কাছাকাছি।

এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরে নয়। এসে থামল একটা থ্রি-স্টার হোটেলের সামনে।

এই হোটেলেরও কে. মিত্রের নামে একটা সিঙ্গেল বেড ঘর আগে থেকেই বুক করা আছে। আবদুল মিঞার বাড়িতে স্থানাভাব নেই—বড় এ/সি গেসটরুম আছে। তবু তিনি অগ্রিম এই ব্যবস্থাটি করে রেখেছেন। ড্রাইভার হিন্দিতে জানালো, আমার সাহেবকে বাড়িতে বা দোকানে ফোনটোন করবেন না। প্রয়োজনে তিনিই যোগাযোগ করবেন। আপনি যা যা অর্ডার দেবেন, শুধু ভাউচারে সই করে দেবেন। নগদ পেমেন্ট কিছু করবেন না। আমি রাত সাড়ে আটটায় আবার আসব।

কৌশিকের সঙ্গে একটা ক্রাইম থ্রিলার ছিল। সে সারাদিন বই পড়ল, টি.ভি দেখল, কর্মহীন একটা অলস দিন অতিবাহিত করে দিল হোটেলের পশ্চিম দিকের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। সেদিকে সূর্যাস্ত হল। শুভ্রপক্ষ গাংচিল দলের ক্রমাগত ওড়াউড়ি। কলকাতায় একটা ফোন করল। তার নিরাপদ পৌঁছানো সংবাদ আর হোটেলের টেলিফোন নম্বর জানিয়ে দিতে।

রাত সাড়ে-আট ৭ র হয়ে গেল। লোকটা এল আরও আধঘণ্টা পরে। বিলম্ব হওয়ার জন্য মাফি চাইল। তারপর বলল, আসুন স্যর, এবার আমরা যাব—

—কোথায়? জনাব আবদুল লতিফের বাড়িতে?

—জি না। বাম্রা পুলিশ স্টেশন। ওখানেই ওঁরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কৌশিক কথা বাড়ালো না। ‘ওঁরা’ বলতে কারা, তাও জানতে চাইল না। রওনা হল ফিয়াট গাড়িতে।

বাম্রা পুলিশ স্টেশনে অপেক্ষা করছিল নিখিল দাশ। ধড়াচূড়া পরা। বলল, এস কৌশিক, আলাপ করিয়ে দিই—ইনি মিস্টার সঞ্জয় সিং, বাম্রা পি.এস্-ইনচার্জ। খবর ভাল। লোকটা হাতেনাতে ধরা পড়েছে। আবদুল মিঞার বাড়ির কাছাকাছি। তবে অনেকটা দূরে। কোন ‘ইয়ের ব্যাটা’ বলতে পারবে না : এই ধরিয়ে দেবার মধ্যে জহুরী আবদুল মিঞা-সাহেবের কোনো হাত আছে, নেক্লেসটা রসিদ দিয়ে ক্যালকাটা পুলিশের তরফে আমি নিয়েছি। দেখবে?

কৌশিক ইংরেজিতে বলে, এমন জিনিস তো বাজারে খরিদ করে বউকে উপহার দিতে পারব না, কী বলেন সিংজী? একটু হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। তাতেই তৃপ্তি।

ও.সি. সাহেব তাঁর গৌফ চুমড়িয়ে শুধু বললেন, সহী বাৎ!

নেক্লেসটা বেশ বড় আর ভারী। তিন তিন ছয় আর মাঝখানে একটা বড় পান্নার লকেট। আবদুল মিঞা বাড়িয়ে বলেননি—লাখ দুয়েকের বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়।

নিখিল বলে, লোকটা একটা দাগী জুয়েল থিফ। বার্গলারি কেসে মেয়াদও খেটেছে বার-তিনেক। তবে আলমারি ভেঙে গহনা হাতানো ছাড়া আর কোন দিকে ঝাঁক নেই। খুন-খারাপির চার্জ কোনোদিন ওঠেনি খাতায়। ওর এলাকা মুম্বাই শহর। কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাইতেও ওদের গ্যাঙটাকে কাজ করতে দেখা গেছে।

কৌশিক জানতে চায়, কী নাম লোকটার?

সঞ্জয় সিং আগ্ বাড়িয়ে হিন্দিতে জবাব দেন, দেখুন স্যার, এসব লোকের হরেক কিসিমের নাম থাকে। এরও আছে। পিতৃদত্ত নামটা কী জানি না। মিস্টার দাশ ওকে দেখে বলছেন, লালবাজারে, মানে ওর কলকাতাইয়া নাম : নেড়া করিম।

কৌশিক জানতে চায়, ‘নেড়া করিম’? কেন? এমন অদ্ভুত নাম কেন? লোকটা কি নেড়া?

জবাব দিলেন সঞ্জয় : যুল ব্রেনারের মতো নিপাট কামানো মাথা। লোকটা অর্ডার দিয়ে গোটা কতক পরচুল বানিয়ে রেখেছে। হায়দরাবাদে ওর মাথায় বিরাট বাবুরি, এখানে ‘গুলিট’-এর মতো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কোলকাতায় নেড়া বোষ্টম। কোথাও ওর দাড়ি-গোঁফ দুইই আছে; কোথাও দাড়ি আছে, গোঁফ নেই; কোথাও গোঁফ আছে দাড়ি কামানো! কলকাতায় শুনেছি—

নিখিল ওঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ। গোঁফ-দাড়ি নিপাট কামানো। তবে বছর দুই-আড়াই ওকে দেখা যায়নি। অদ্ভুত কলকাতার জুয়েলারি মার্কেটে অথবা ধনীর প্রাসাদে।

সঞ্জয় বললেন, এখানেও সে অনেকদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ছিল। দেড় দু-বছরের মধ্যে ও অ্যারেস্ট হয়নি। কোনো জুয়েল লিটিং বা বার্গলারি কেসে ওকে সন্দেহের তালিকাতেও পাওয়া যায়নি। ওদের গোটা গ্যাঙটাই বেশ কিছুদিন ইনঅপারেটিভ হয়ে গেছিল।

নিখিল জানতে চায়, গোটা গ্যাঙ বলতে?

—ওরা দলে ছিল তিন-চার জন। সম্ভবত নেড়া করিমই ছিল দলের পাণ্ডা। আর ছিল একজন বিহারী—সে লোকটাও ইদানীং না-পান্তা। এছাড়া ছিল একজন গোয়ানিজ ইয়াং-ম্যান : আলফান্সা। সেও কর্পুরের মতো উপে গেছে। আমাদের রেকর্ডে দেখছি—নেড়া করিমের একটি মহিলা সহযোগীও এককালে ছিল। কেউ বলে, সে নেড়া করিমের জরুর, কেউ বলে রক্ষিতা। মেয়েটি সুন্দরী। বছর পঁচিশ বয়স। কিন্তু তারও কোনো পান্তা ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে একবার

মাসছয়েকের জন্যে তার সাজাও হয়ে যায়। ধরা পড়ে ওদের সঙ্গে ; কিন্তু গহনা চুরির কেস-এ সে ছাড়া পেয়ে যায়—

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, এই যে বললেন, মাসছয়েক মেয়াদ খাটে?

—হ্যাঁ। মিথো সাক্ষী দেবাব অপরাধে। ‘আন্ডার ওথ’ সজ্ঞানে মিথো সাক্ষী দিয়েছিল বলে। সে মেয়েটিও এখন না-পান্তা।

কৌশিক জানতে চায়, নেড়া করিম কী করে? থাকে কোথায়?

—বর্তমান নিবাস বোরিভেলি পাহাড়ের গায়ে একটা মুসলমান বস্তিতে। কাজ করে কান্দিভেলিতে। একটা মটোর রিপেয়ারিং শপে। গাড়ি রঙ করার কাজ। আমরা যাব ওর বাড়িতে এবং দোকানে। আপনাদের আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

নিখিল বলে, নেকলেসটা কীভাবে ওর ঝোলার ভিতর এল, সে বিষয়েও নিজে কী বলছে?

—বলছে : ও জানে না। ধরা পড়েই ওর তাত্ক্ষণিক স্টেটমেন্ট : এটা কীভাবে তার বিগ-শপার ব্যাগে এসেছে তা ও জানে না। ওর কোনও ‘শ্যালিকাসুত্র’ ওকে ফাঁসাবার জন্য এভাবে ওর ঝোলার ভিতর একটা সোনাব গহনা ফেলে দিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছে।

—সেই ‘শ্যালকপুত্রে’র উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে ও কী বলছে?

সঞ্জয় বলে ‘দ্যা সেম কক্ অ্যান্ড বুল স্টোরি’। শেষবার মেয়াদ খেটে বেরিয়ে আসার পর ওদের গ্যাঙটা আবার ওকে দলে ফিরে যেতে ডাকছে। কিন্তু ও রাজি নয়, কারণ ইতিমধ্যে ও ‘ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির’ হয়ে গেছে। রঙ মিস্ত্রির জীবিকা ছেড়ে সে যেতে চাইল না। তাই এভাবে ওকে ফাঁসানো হল।

—দেড়-দুলাখ টাকার একটা নেকলেসের বিনিময়ে?

—তাই তো বলছি : কক অ্যান্ড বুল স্টোরি! গুছিয়ে একটা মিথ্যা গল্পও বলতে পাবেনি লোকটা। নেড়াকে ডেকে পাঠাব? কথা বলবেন?

কৌশিক বললে, হ্যাঁ, লোকটাকে একবার চাক্ষুষ দেখে নেওয়া যাক। দু-চারটে প্রশ্নও করা যাবে, যাতে ওর বাড়ি বা দোকানের লোকের জবানবন্দির সঙ্গে ওর বক্তব্য কতটা মেলে যাচাই করে নেওয়া যায়।

ও.সির নির্দেশমতো নেড়া-করিমকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় নিয়ে এল একজন সশস্ত্র পুলিশ। নেড়া করিম খর্বকায় এবং স্থূলকায়। বয়স পঞ্চাশের এপাবে নয়। ও.সি. বললেন, ওই টুলটাতে বস, করিম। তুমি নিজেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ—ধরা পড়ার পরেই তুমি যে-কথা বলেছিলে তা দাঁড়ায় না! তোমাকে দলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায় কোনো শালা তোমার ব্যাগে দু-লাখ টাকার একটা গহনা

ঝেড়ে দেবে না!...না, না, কোনো কথা বল না। আগে শোন, আমি কী বলতে চাইছি এক নম্বর কথা : তুমি ফেঁসে গেছ। হাতে-নাতে ধরা পড়েছ। তোমার আবার মেয়াদ হয়ে যাবেই। কোনো শালা ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাদের বড়ে দাও—সচ্ছ বাতা দেও—কীভাবে তুমি ওটা পেলে, তাহলে তোমার বিরুদ্ধে গহনাচুরির কেসই আমরা আনব না। আনব চোরাই মাল পাচার করার অভিযোগ চুরির দায়ে সাজা হলে দু-তিন বছর এই বুড়ো বয়সে ঘানি টানতে হবে। কিন্তু চোরাই মাল বেচার অপরাধ বড় জোর ছ-মাস জেল হবে। বাকি দলটা ধরা পড়লে, তুমি যদি রাজসাক্ষী হও তাহলে বেকসুর খালাসও হয়ে যেতে পার! দেখ ভেবে, সত্যি কথাটা বলবে কি না।

লোকটা মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবল। তার পর বললে। হুজুর ওরা আমাকে জানে মেরে দেবে।

—দেবে না। সবকটাকে জেলে ঢুকিয়ে দেব। তাছাড়া তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে রাজসাক্ষী করবই না আমরা। তুমি শুধু জানিয়ে দাও কে কোথায় তোমাকে এটা এনে দিয়েছিল। মুম্বাই বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলেছিল। আমরা জানি, তুমি ওই দল ছেড়ে দিয়েছ। সৎভাবে কান্ডিভালিতে একটা মটোর রিপেয়ারিং শপে রঙ মিস্ত্রির কাজ করছ। আমরা আরও জানি, তোমাদের বাকি সবাই—সেই আল্‌ফান্স, আর সেই বিহারী বদমাশটার—কী যেন নাম মনে নেই...

নেড়া করিম হঠাৎ ধরতাইটা ধরিয়ে দেয়, ব্রিজলাল কাহার—হুজুর!

—হ্যাঁ, ব্রিজলাল! তাদের কারও সঙ্গে মুম্বাই জহরী বাজারের জান পহ্‌চান নেই। তুমিই এতদিন চোরাই মাল পাচার করেছ। মুম্বাই, হায়দরাবাদ, কলকাতার অনেক জহরীর সঙ্গে তোমার জান-পহ্‌চান আছে। এ জনাই ওরা তোমাকে দলে ফেরত নিতে চাইছে। এসবই আমাদের জানা। এখন বল, কে কখন তোমাকে এই নেকলেস্টা এনে দিয়েছে। তুমি বাস্তব অঞ্চলের ওই কাঁটার রোডে ওটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে? ওখানে তো কোনও জুয়েলারি দোকান নেই?

নেড়া করিম বললে, হ্যাঁ হুজুর, কবুল খাচ্ছি—এটা আমার ব্যাগে অজান্তে কেউ ফেলে দেয়নি। আমাকে বেচতেই দিয়েছিল। মালটার দাম স্যার, দু-লাখের কম হবে না। কিন্তু দেড়লাখে বেচতে পারলেই আমি এবার পঁচিশ হাজার টাকা মুনাফা করতাম। কারণ আমাকে ওরা জানিয়েছিল শওয়া লাখ পেলেই আমি যেন ওটা ঝেড়ে দিই।

সঞ্জয় জানে—মূল প্রশ্নটা হচ্ছে : কে ওকে বেচতে দিয়েছিল। খুব সম্ভবত এ লোকটা জানে না, ওই অলঙ্কারটার সঙ্গে একটা মার্ডার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা জানলে হয়তো পঁচিশ হাজার টাকা মুনাফার লোভে সে এতবড় দায়িত্বটা নিতই না।

কিন্তু মূল প্রশ্নটা সরাসরি করার আগে লোকটাকে একটু সহজ হবার সুযোগ দিল। জানতে চাইল, তোমাকে হাজতে এরা ঠিকমতো দানাপানি দিচ্ছে তো?

নেড়া হাসি-হাসি মুখে বললে, ও-সব কথা ছেড়ে দিন স্যার। আমি তো এই প্রথমবার শশুরালে আসিনি। এগানকার আপ্যায়ন সম্বন্ধে আমার ঠিকঠাক অভিজ্ঞতা আছে।

সঞ্জয় শুনল না। একটা কস্টেবলকে ডেকে অর্ডার দিল ওর হ্যান্ডকাফ খুলে নিতে। চার পেয়ালা চা আব বিস্কুট আনারও হুকুম দিল।

হাতকড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে প্রৌঢ় মানুষটা একটু স্বস্তি পেল। সঞ্জয়ের অনুরোধে চা-বিস্কুট সেবনেও আপত্তি করল না। বলল, হুজুর, আমি বুড়ো মানুষ। পুরনো দিনেব দোস্তটা এল। বলল, মালটা বাজারে ঝেড়ে দিতে পারলে, বিশ-পঁচিশ হাজার মুনাফা থাকবে। নেকলেসটা ওরা কোথায় হাতিয়েছে—দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, না কানপুর—আমি জানি না। জানতে চাইও না। কী দরকার আমার জেনে? আমি তো চিনির বলদ। চোরাই মালটা জান্-পহচান আদমির কাছে ঝেড়ে দেব। নগদ রুপেয়া শুনে নেব। ব্যস্। তারপর শালার গহনা বেরুট গেল না হংকং, তাতে আমার কী দবকার? কবুল খাছি হুজুর, লোভে পড়ে এটুকু পাপ আমি করেছি। এখন রাখলেও আপনি, মারলেও আপনি।

সঞ্জয় আক্রমণ করল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা দিক থেকে। ওর মনটা নরম করতে। বললে, বোরিভেলি বস্তিতে এখন কে, কে থাকে?

—আমার আবাজান, বিলকুল বুডচা। ঔর আন্মা। চোখে দেখে না। আমাব ঘরওয়ালী আর দুটি মেয়ে।

—ছেলে নেই তোমার?

—ছিল হুজুর। ‘ছিল’ বলছি কেন? ‘আছে’। তবে আমার নাগালের বাইরে। জাহাজের খালাসী হয়ে গেছে সে। দরিয়ায় দরিয়ায় ঘুরে বেড়ায়। দু-পাঁচ বছর পরে মন চাইলে আসে। যখন ওদের জাহাজ মুম্বাই বন্দরে ভেড়ে।

—তোমার ঘরওয়ালীর নাম তো জাহানারা বেগম?

লোকটা চমকে ওঠে। চোখে চোখে তাকায়। পরক্ষণেই বোধহয় ওর পূর্বকথা মনে পড়ে যায়। বছর-তিনেক আগে শেষবার যখন সে ধরা পড়ে তখন ব্রিজলাল আর জাহানারাও ধরা পড়েছিল। ব্রিজলালের দু-বছর সশ্রম সাজা হয়, আর জাহানারার মাত্র ছয়মাসের। মাথা নেড়ে বলে, জী না হুজুর। আমার জরুর নাম ‘ফতিমা’। এ আমার প্রথমপক্ষের।

—আর জাহানারা? যে গতবার তোমার সঙ্গে ধরা পড়েছিল। তারও তো

ছয়মাসের মেয়াদ হয়ে যায়! সে কোথায়?

নেড়া উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে 'থুক' ফেলে এল। গুছিয়ে নিয়ে বসে বললে : দোজখ্।

—দোজখ্? মতলব?

ধীরে ধীরে একটি বেদনার কাহিনী মেলে ধরল নেড়া। তার নিজের দু-বছরের মেয়াদ হয়েছিল। তার দ্বিতীয় পক্ষের বিবি জাহানারার হয়েছিল মাত্র ছয় মাসের কারাদণ্ড। নেড়া আশা করছিল মুক্তি পাবার পর জাহানারা আসবে তার খসমের সঙ্গে দেখা করতে। গবাদ দেওয়া খুপির ভেতর থেকে অনেক অনেক দিন পর সে দেখবে তার সুন্দরী স্ত্রীকে। কিন্তু জাহানারা এল না। এক মাস দু'মাস তিনমাস। তারপর একদিন সন্ধ্যায় সময়ে দেখা করতে এল ওর প্রথমপক্ষের বিবি, ফতিমা। তার কাছেই পেল সংবাদ : পাখি উড়ে গেছে। ওরই হাতে গড়া সাগরেদ আলফান্সোর সঙ্গে। চরম বেইমানি। আলফান্সোকে নেড়াই নিয়ে এসেছিল এ লাইনে। হাতে ধরে সব কিছু শিখিয়েছিল। গতবার সে ধরা পড়েনি। ফাঁক-ফোকর দিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল। পুলিশে তার পাত্তা পায়নি। জাহানারা যেদিন জেনানা ফটক থেকে ছাড়া পায় সেদিন ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল আলফান্স! জাহানারা জানত, সে নিজে অনিকেত। এতদিন সে ছিল একটা বস্তির ঘরে, নেড়া করিমের সঙ্গে। সে আশ্রয় হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওর খসম এখনো মেয়াদ খাটছে। জেলখানা থেকে মুক্তি পেল জাহানারা বিলকুল খালি হাতে। তবে একেবারে নাস্তা ভিখারি নয়। তার ছিল দু-দুটি সম্পদ—জওয়ানি আর খুবসুরতি।

না, জাহানাবাকে দোষ দেয় না নেড়া। মেয়েটার সঙ্গে তার নিজের বয়সের ফারাকটাও তো দেখতে হবে। জাহানারা পঁচিশ, ও তার ডবল : পঞ্চাশ। নেহাত দম্পতি—তাই এতদিন ব্রিজলাল বা আলফান্স জাহানারার দিকে হাত বাড়ায়নি। আর মাঝে মাঝে বাড়াতো কি না তাই কি ছাই ও জানে? মোট কথা প্রথমা বিবির মুখে শুনল : আলফান্সের সঙ্গে জাহানাবা নিকা করেছে। ওরা দুজনেই ভারত পুলিশের নাগালের বাইরে পালিয়ে গেছে। কে জাহানারার প্লেন ফেয়ার দিল নেড়া জানে না—আন্দাজ করতে পারে মাত্র। আলফান্স ওর সঙ্গে হয়তো যায়নি হয়তো বেচে দিয়েছে কোন আরব-শেখকে। জাহানারার বিমানভাড়া হয়তো মিটিয়েছে তার সেই দুই সম্পদই : খুবসুরতি আর জওয়ানি।

হয়তো সে এখন সেই মধ্য প্রাচ্যের আরব শেখের হারেমে আরামেই আছে। দুঃখ করে না নেড়া। এ তার বদনসিব্।

সঞ্জয় ওকে খোলাখুলি বললে, দেখ করিম! তুমি ওই নেকলেসটা চুরির ব্যাপারে

জড়িত এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু কে তোমাকে ওটা বিক্রি করতে দিয়েছে তার নামটা তুমি যদি না জানাও তাহলে বাধ্য হয়েই তোমার বিরুদ্ধে চুরি বেসে সাজাতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি—নেকলেসটা চুরি গেছে কলকাতাবাসী এক শেঠ-এব বাড়ি থেকে। তাই কলকাতা থেকে এসেছেন এই অফিসার। উনি শনাক্ত করেছেন গহনাটা। এখন বল, তুমি কতদিন আগে কলকাতা গেছিলে?

নেড়া তার চিবুক চুলকিয়ে বললে, য্যাদ নেই হুজুর। মেয়াদ খেটে বার হয়েছি আজ একবছরের উপর। জেলেও ছিলাম বছর দেড়েক। ফলে, কলকাতায় শেষবার গেছি অন্তত তিন-চার বছর আগে।

—তাহলে তুমি কী স্থির করলে বল? তুমি বুড়োমানুষ। কথা আদায় করতে ওসব 'কচুয়া ধোলাই টোলাই' তোমাকে দেব না। তোমার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। এক : কে তোমাকে নেকলেসটা এনে দিয়েছিল তাব নাম এবং কোথায় তোমার কাছ থেকে দেড়লাখ টাকা সে নিতে আসত তা আমাদের গোপনে জানিয়ে দাও। আমরা যে তোমার মাধ্যমে জেনেছি এটা গোপন থাকবে—

—তাই কি কখনো থাকে, হুজুর?

—থাকে! পুলিশ কোথা থেকে কীভাবে কোন খবর পায় তা কি জানাজানি হয়? এই যে আজ তোমাকে বান্দ্রা স্টেশনের বাইরে অটো রিক্শায় ওঠার মুখে চোরাই মালসহ আমরা গ্রেপ্তার করলাম, এটা কীভাবে? বান্দ্রা এলাকায় তো কোন সোনারপার দোকান নেই। তাহলে তোমাকে ধরলাম কীভাবে?

—সেটাই তো ভাবছি, হুজুর।

—সে ভাবনা ছেড়ে দাও। বরং ভেবে দেখ কোন সাজাটা তোমার মনপসন্দ। চোরাই মাল বিক্রির চেষ্টায় বড় জোর ছয় মাস? নাকি দু-লাখ টাকার গহনা চুরি—যার মেয়াদ না হোক দুটি বছর ঘানি টানা!...না, না, এখনি কিছু ফস্ করে বলে বস না। একটা রাত ভাল করে ভেবে দেখ। কাল সকালে জবাব দিও!

কান্দিভেলি বা বোরিভেলিতে সমস্যার কোনও সুরাহা হল না। কান্দিভেলিতে যে মটোর রিপেয়ারিং শপে ও রঙ মিস্ত্রির কাজ করে তার মালিক যুক্তপ্রদেশের লোক : রামবিলাস মিশির। প্রৌঢ় নির্বিরোধী ব্রাহ্মণ। দোকানটা মাত্র বছর দুই-তিন খুলে বসেছেন। কিন্তু প্রচুর কাজ পাচ্ছেন। আট-দশ জন লোক দিবারাত্র কাজ করে তাঁর গ্যারেজে। হ্যাঁ, মহম্মদ করিমকে তিনি চেনেন। বোরিভেলির একটা মুসলমান বস্তিতে থাকে। হ্যাঁ, উনি জানেন, লোকটা দাগী আসামী। বছর দুই আগে জেল থেকে বার হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। উনিই দয়া করে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। রামজীর কৃপা হলে হয়তো তার জীবনযাত্রাই বদলে যাবে। না—গতমাস

খানেকের মধ্যে মহম্মদ করিম একদিনও কামাই করেনি। গতকাল সে অবশ্য ‘উল্টি টাইমে’ ছুটি নিয়েছিল। আজ এত বেলাতেও সে কেন যে আসেনি তা উনি আন্দাজ করতে পারছেন না। জ্বরজ্বর হয়ে থাকবে। অথবা তার আব্বাজান—তিনি খুব বুড়ো—ঠাঁরই কিছু হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ নেড়া করিম যে নেকলেসচুরির দায়ে থানার হাজতে এ সংবাদটা তার অজানা।

বোরিভেলির বস্তিতেও একই হালৎ। বাড়ির লোক জানে না, কেন কাল রাতে মানুষটা ঘরে ফিরল না। ওরা আশঙ্কা করেছিল : পথ দুর্ঘটনা! বাস-অ্যাকসিডেন্ট! পুলিশ দেখে বেরিয়ে এল সবাই। জড়ো হল বস্তির আশপাশের মানুষ। কী হয়েছে, স্যার?

সঞ্জয় সিং অনর্গল মিথ্যার সাহায্যে বক্তিবাসীর কৌতূহলকে প্রশমিত করল। হ্যাঁ, মহম্মদ করিম কাল বাজ্জা স্টেশনের কাছে একটা মটোর গাড়ির ধাক্কা খেয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আঘাত মারাত্মক নয়। দু-চার দিনের মধ্যেই ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। ওর জ্ঞান আছে। এই ঠিকানায় নাকি ওর জরুর ‘ফতিমা বিবি’ থাকে। তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ‘ফতিমা’ কার নাম?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে বছর চল্লিশের একটি মহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে। জানতে চায়, হাত পা কাটা যায়নি তো হজুর?

—না, না, তেমন কিছু নয়। দুদিনেই ছাড়া পেয়ে যাবে হাসপাতাল থেকে।

সঞ্জয়ের সঙ্গে এক মহিলা পুলিশও এসেছিল, সে বলল, ভিতরে চলুন দিদি, কথা আছে।

ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, করিম ভাই ভালই আছে। ওর হাঁটুতে কিছুটা চোট লেগেছে। শরীরে আর কোনও ক্ষতি হয়নি। আপনি ওর জন্য একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া একটা পোঁটলায় বেঁধে দিন। আর, টুথব্রাশ ব্যবহার করে কি কবির ভাই?

—জী না। দাঁতন।

—ও আচ্ছা। মেয়েরা বাড়িতেই থাক। বুড়ো দাদু দিদাকে দেখভাল করতে পারবে। আর আচ্ছা, ফতেমা দিদি, ‘জাহানারা’ কার নাম?

রীতিমতো চমকে উঠল ফতিমা, কৈও?

—প্রথম দিকে, যখন ওঁর ভালো করে জ্ঞান হয়নি তখন উনি বার বার জাহানারার কথা বলছিলেন। আপনার মেয়ে দুটির মধ্যে কারও নাম কি—

কথার মাঝখানেই ফতিমা বলে ওঠে, জী নেহী! বহু ইহা নেহী রহতি।

—ওজর গয়ী?

—জী নেহী! ভাগ গয়ী।

বুঝিয়ে বলে, সে ছিল মহম্মদ করিমের দ্বিতীয় পক্ষের বিবি। বড়ি বদমাইশ। পুলিশনে উনকী পকড় লি। ছে মাহিনেকা লিয়ে সাজা ভি ছয়ী...

—তারপর? খালাস হবার পর?

—না জানে কোথায় ভেগেছে! তবে আমার ঘাড় থেকে তো নেমেছে! খোদার মেহেরবানি।

—সে কি এখানেই থাকত? এই বাড়িতে?

—জী নহী! অন্য বস্তিতে। কিন্তু তার খোঁজ এত নিচ্ছেন কেন? সে তো দু-বছর হল নাপাত্তা!

—না...মানে...অসুস্থ লোকটা তার নাম করে বার বার খোঁজ করছে—

—তবে বলুন দোজখে তার পাত্তা নিতে! সে দোজখেই আছে!

একটু ইতস্তত করে মহিলা পুলিশ জানতে চাইল, তার কোন তসবির মানে ফটো টটো আছে?

ফতিমা রুখে ওঠে, জী নহী! বহ্ কস্‌বি কী নাম ইঁহা মং লিজিয়ে!

বারো

দিন দুই পরে ওরা ফিরে এল কলকাতায়। নেড়া করিম তার দলের লোকের নাম বলেনি। মানে বলেছে, কিন্তু ‘ধরি মাছ, না ছুঁই পানি’ পদ্ধতিতে। ইঁয়া, নেকলেস্টা ওকে বিক্রি করতে দিয়েছিল ওর সেই পুরনো দিনের দোস্ত—ব্রিজলাল কাহার। কিন্তু তার পাত্তা ও জানে না। কথা ছিল, ব্রিজলাল এসে ওর কান্দিভেলির কর্মস্থলে মাঝে মাঝে ফোনে খবর নেবে। মালটা বেড়ে দেওয়া হয়েছে জান্লে সে ওই দোকান থেকেই নগদে সওয়া লাখ টাকা নিয়ে যেত। মুম্বাইয়ে সে কোন ঠিকানায় থাকে তা নেড়া করিম জানে না। ব্যস! চ্যাপ্টার ক্লোজড!

খবরে খুশি হতে পারলেন না দস্তুর-সাহেব। নেকলেস্টা উদ্ধার হয়েছে জেনে তিনি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালেন না। নিখিল দাশ নিজেও খুশি হতে পারেনি।

বাসু-সাহেব ওদের কাছ থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে শুনলেন। বললেন, সমাধানের দিকে আমরা এখনো একপদও অগ্রসর হতে পারিনি। এমনকি দ্বিধারাটাও এখনো একমুখি হল না।

সুজাতা বলে, ‘দ্বিধারা’ মানে?

—হত্যার উদ্দেশ্যটা তো দুই ধারায় বইছে। প্রথম থেকেই। যদি সম্পত্তির লোভে প্রফেশনাল মার্ভারার এন্‌গেজড করা হয়ে থাকে তাহলে প্রাইম সাস্পেক্ট

রূপেশ মালহোত্রা। সেকেন্ডলি : পামেলা কাত্রোচি। উভয় ক্ষেত্রেই খুনীকে সম্ভবত ওই আট দশ লাখ টাকায় পুরস্কৃত করা হয়েছে। আর যদি সম্পত্তির লোভে কমলকলিকে খুন করা না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জানতে হবে—কে, কে জানতো যে ফাস্ট-ব্লাস কুপেতে কমলকলি অরক্ষিতা অবস্থায় দশ লক্ষ টাকার গহনা নিয়ে চলেছে!

সুজাতা বলে, আমরা জানি : অনেকেই সেটা জানত। আবার এমনও হতে পারে আরও অনেকে হয়তো জানতো, যে খবর আমরা জানি না।

নিখিল বলে, তা ঠিক। রূপেশ আর বিক্রমজিৎ জানত। দস্তুর সাহেব, পামেলা জানতেন, সোমা হাজরা জানত, হয়তো হেড বাবুর্চি ইসমাইল, বা ওঁর হেড বেহারাও জানত। এমনকি দস্তুর-সাহেবের কাজিনের পুত্র, পুত্রবধু—মানে, যাদের বিয়ের অ্যানিভার্সারিতে কমলকলি চাঁদিপুর যাচ্ছিল, হয়তো তারাও তথ্যটা জানত। আমরা তা জানি না।

বাসু বললেন, আরও একজন জানত। তার নাম তুমি করলে না।

নিখিল বলে, আর কে?

—কমলকলি নিজে।

পরিবেশটা এতই ঘন হয়ে উঠেছে যে, এ রসিকতায় কেউ কিন্তু হাসল না। বাসু অতঃপর জানতে চান, নেড়া করিমের এমপ্লয়ার, মানে সেই কান্দিভিলির রিপেয়ার শপ ওনারের বয়স কত? দেখতে কেমন?

কৌশিক বলে, টিপিক্যাল বিহারী ব্রাহ্মণ। তবে স্বাস্থ্য ভালো। লম্বা-চওড়া। কপালে ত্রিপুভ্রুক, মাথায় কাঁচাপাকা চুলে লম্বা টিকি। চোখে বাইফোকাল। রঙ কালো। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ।

বাসু চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন। হঠাৎ বলেন, আর নেড়া করিম? বেঁটে আর মোটা?

—আঞ্জে হ্যাঁ। রীতিমতো বেঁটে আর মোটাও। কিন্তু আপনি কী ভাবে...

—বাস্ বাস্ বাস্। আর কিন্তু টিঙ্গ নয়। জিগ্‌স ধাঁধার ওই একটা পীস্‌ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন নাইন্টি-এইট পার্সেন্ট চান্স আমার সলুশান হয়ে গেছে। বাকি দু-পার্সেন্ট লুকানো আছে লাউডন স্ট্রিটে। রানু, তুমি দস্তুরকে একবার টেলিফোনে ধর তো!

রানীদেবী তাঁর ছইল চেয়ারে পাক মেরে টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন। বাসু বলেন, নিখিল, তোমারও একটা জরুরী কাজ আছে। এখনই সঞ্জয় সিংকে একটা ফ্যাক্স করে দাও—কান্দিভেলির রামবিলাস মিশিরকে যেন তিন শিফটে নজরবন্দি করে রাখে। জাস্ট ফর টু ডেজ। লোকটা যেন পালাতে না পারে।

কৌশিক বলে, রামবিলাস মিশির? কেন? তার কী অপরাধ?

—বাঃ! তুমিই তো বললে, কপালে ত্রিপুরুক, মাথায় টিকি।

রানু টেলিফোনে দস্তুরকে ধরেছেন। বাসু বললেন, লুক হিয়ার মিস্টার দস্তুর! সেদিন সন্ধ্যায় আপনি অযাচিত আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আজ আমি একটা রিটার্ন ভিজিট দিতে চাই। রাইট নাউ। ইন হাফ অ্যান আওয়ার! আপনার সময় হবে?

—হবে, নিশ্চয় হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—আপনি টেপ-রেকর্ডারের বোতামটা টেপেননি তো?

—না, না! কী যে বলেন!

—তাহলে বলি, আপনি আমাকে যে কাজটা অ্যাসাইন করে ছিলেন তার সমাধান হয়ে গেছে—

—মানে? আপনি জানেন, কে ট্রেনের কামরার মধ্যে কলিকে...

উনি বাক্যটা শেষ করার আগেই বাসু-সাহেব বলেন, ইয়েস্ স্যার! শুধু তাই নয়, সেই গোলাপীখামে যে ভদ্রলোক চিঠি লিখেছিলেন তাঁর পরিচয়টাও। বাই দ্য ওয়ে মিস্ পামেলা কাত্রোচ্চি বাড়িতে আছেন তো?

—না নেই। আমরা পুরী থেকে ফিরে আসার সময় সে ওখানেই থেকে গেছে। ‘তোশলী স্যান্ডস বীচ’-এ। আজই তার ফেরার কথা।

—অন্তত মিস্ সোমা হাজরা তো আছে? তার কাছে দু-একটা কথা জানার আছে। দস্তুর বলেন, সরি স্যার। সেও কলকাতায় নেই। দুদিনের ছুটি নিয়ে বর্ধমানে গেছে। তবে আজই তার ফেরার কথা। সন্ধ্যাবেলা।

—তা হলে আমরা এখনই আসব?

—বাই অল মীনস্।

—আমার সঙ্গে নিখিল আর সুকৌশলী দম্পতি থাকবে—

—যু আর অল ওয়েল কাম!

দস্তুর-সাহেব দস্তুরমতো উত্তেজিত। বাড়ির বাইরে পায়চারি করছিলেন। পর পর দুখানি গাড়ি এসে ভিড়ল পোর্টেকোতে। পুলিশের জিপ আর কৌশিকের ফিয়াট। সেদিনকার সেই বেয়ারা এগিয়ে এসে খুলে দিল ফিয়াট গাড়ির দরজা। দস্তুর আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে বসালেন তাঁর বৈঠকখানায়।

বাসু সরাসরি কাজের কথায় এলেন, আমি কলি-মার ঘরটা একটু দেখব। আপনি আপনার সেই ডুম্নিকেট চাবির থোকাটা নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

কৌশিক, সূজাতা ও নিখিলকে বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর। আমরা পনেরো মিনিটের ভিতরেই ঘুরে আসছি।

ঘর থেকে নির্জন করিডোরে বার হয়েই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন দস্তুর। বাসুর হাত দুটি ধরে বললেন, টেল মি স্যার? ইজ ইট রূপেশ?

—নো! ইট ইজ নট! কিন্তু এভাবে মাঝপথে আমাকে রুখে দেবেন না প্লিজ লোকটাকে আমি চিহ্নিত করেছি। তার পালাবার পথ নেই। কিন্তু নামটা জানানোর আগে আই মাস্ট সিকিওর দ্য মোস্ট ভাইটাল কনক্লুসিভ এভিডেন্স! সবার আগে দেখতে হবে, সেটা যেন বেহাত হয়ে না যায়। আসুন।

দস্তুর আর কথা বাড়ালেন না। দুজনে এসে দাঁড়ালেন কমলকলির তালাবন্ধ ঘরের সামনে। দস্তুর চাবির গোছা থেকে একটি চাবি বার করে গোদ্রেরজের তালা খুলে দিলেন। ঘরে ঢুকেই তিন-চারটে সুইচ জ্বলে দিলেন। ঘরটা আলোয় আলো হয়ে গেল। চালু হল এয়ার-কন্ডিশনারটা। বন্ধ করে দিলেন ফ্লাশ পান্নাটা।

ঘরে একটা প্রকাণ্ড ডবলবেড খাট। একান্তে একটা টেবিলের উপর কমলকলির একটা এনলার্জড ফটো। মাল্যভূষিত। ঘরে ধুনোর গন্ধ। একান্তে সোফা সেটি সেন্টার টেবল্। বাসু চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে একটা সোফায় বসে বললেন, বসুন আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমার ধারণা : আমি সমাধানে উপনীত হয়েছি—কিন্তু একটু আগেই যে-কথা বললাম : মার্ডার কেস-এ একেবারে পাথুরে প্রমাণ দিতে না পারলে ডেথ্ সেন্টেন্স হয় না। সেই পাথুরে প্রমাণের সন্ধানই আমি এখন এসেছি।

দস্তুর বললেন : সার্চ দ্য রুম, ইফ যু প্লিজ।

—দেখছি। তার আগে জানিয়ে দিই—আপনাকে টেনশনমুক্ত করতে—সেই গোলাপী রঙের খামে চিঠিখানা বিক্রমজিৎ লেখনি। আপনার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহোত্তর জীবনে কোনোও অসৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

—তাহলে কে লিখেছে সেই চিঠিখানা? যেটা আমি তার প্রাইভেট ড্রয়ার থেকে আবিষ্কার করি? আর কে হতে পারে?

—বলছি। তার আগে আপনার হেড কুককে একবার এঘরে আসতে বলুন।

—হেডকুক? অফ অল পার্সেন্স, আমার হেডকুক! কেন? ...ও আয়াম সরি ঘরের সুইচবোর্ডে একটা কলবেল ছিল। সেটা টিপে দিলেন। এল একজ্ঞা খিদমদগার। তাকে বললেন, ইসমাইলকে ডেকে দে। বল জরুরী দরকার।

মিনিট খানেকের ভিতরেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল মহম্মদ ইসমাইল দস্তুর প্যালেসের শেফ্। খানদানী হোটেলে যেমন থাকে সফেদ চোগামতো টুপি মাথায়। নত হয়ে সেলাম করে বললে, হুকুম ফরমাইয়ে সা'ব? ক্যা বানানা হয়

দস্তুর তাকে বুঝিয়ে বললেন ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন বাসু সাহেব—ওঁ:

খানদানী মেহমান। লোকটা পুনরায় সেলাম করে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। বাসু হিন্দিতে বললেন, না, ইসমাইল কোন খাবার বানাবার ফরমায়েশ দেব বলে তোমাকে ডেকে পাঠাইনি। তোমার কাছে দু-একটা খবর জানতে এসেছি। তবে কথাটা তোমার ঠিক ঠাক মনে নাও থাকতে পারে। পাঁচ সাতদিন আগেকার কথা। তোমার যদি ঠিক মতো য্যাদ না হয় তাহলে কিচেনের আর পাঁচজন বাবুর্চি খানসামার সঙ্গে শলাহ্ করেও আমাকে জানাতে পার। আমি অপেক্ষা করব।

—লেকিন সওয়াল ক্যা হয়, জনাব?

—মিসেস মালহোত্রা, মানে কমলকলি দিদিমণি যেদিন—মানে, বুধবার উনত্রিশ তারিখ সকালবেলা—ট্রেন ধরতে যান, সেদিন সকালে তিনি কি ব্রেকফাস্ট খেয়ে যান?

—জী হাঁ সা'ব! মেরা য্যাদ হয়।

—কী খেয়েছিলেন তা কি তোমার মনে আছে?

ইসমাইল লক্ষ্যবীণী বিনয়ে বিগলিত হয়ে খানদানী উর্দুতে যা নিবেদন করল তা এইরকম :

—জী হাঁ সরকার! আমার সম্পূর্ণ স্মরণে আছে। ক্যোঁও কি আমার হাতের রান্না দিদিমণি সেই শেষবার গ্রহণ করেন। তারপর আর কিছু তাঁকে রন্ধে খাওয়াতে পারিনি। সেদিন ব্রেকফাস্টে আমি তাঁকে পরিবেশন করেছিলাম চারখানি আলুর পরোটা, মুর্গ-মটর, একটা ওমলেট, সালাড, আর দু পিস সন্দেশ। লেকিন উনি মাত্র দু-পিস পরোটা নিলেন। ওমলেট ছুলেন না। সন্দেশও একটা মাত্র গেলেন।

—কোথায় বসে খেলেন? 'ডাইনিং-হল'-এ?

—জী না। ওঁর ওয়াস্ত কম ছিল। উনি ট্রেন ধরার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন আমি এঘরেই ওঁর খাবার এনে দিয়েছিলাম। ওই টেবিলে বসে উনি ঝটপট ছোট-হাজরি খেয়ে নিলেন।

—ঘরে তখন আর কে ছিল? আর কে তাঁকে এঘরে বসে খেতে দেখেছে?

—আর কে থাকবে হুজুর? সোমা দিদিমণি শুধু ছিলেন। আর পরে রতন জুঠা বর্তন উঠিয়ে নিতে এসেছিল। সে দেখেছে। রতনের নিশ্চয় য্যাদ হবে। ক্যোঁও কি দিদি রতনকে বলেছিলেন, 'রতন পরোটা আর ওমলেট জুঠা করিনি। তুই খেয়ে নিস্।'

বাসু জানতে চান, তখন দিদিমণি কি একটা কালো শিফন শাড়ি পরে ছিল?

—হুজৌর, 'শিফন' কাকে বলে আমি জানি না। তবে দিদিমণি ঘোর কালো রঙের মসলিন-তরিকা শাড়ি পরেছিলেন, ওই কাপড়ে তৈরি জ্যাকেট ভি পিহ্নে হয়ে ব্রেকফাস্ট খায়ী!

বাসু দস্তুরের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, লোকটার মেমারি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে আমি যদি ওকে একশ টাকা বক্শিস্ দিই আপনি কিছু মনে করবেন?

—অফকোর্স! বলে দস্তুর ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁর হেডকুকের দিকে। পকেট থেকে একটা পাঁচশ টাকার নোট বার করে, তাকে দিয়ে বললেন সাহেব তোমাকে এই ‘তোফা’ দিতে বলছেন, দিদিমণিকে তুমি ভালবাস, তাঁর কথা তোমার এত চমৎকার ভাবে মনে আছে। তারই জন্যে এই তোফা।

লোকটা লম্বা সেলাম দিয়ে বিদায় হল।

বাসু বললেন, এবার চলুন, মিস্ সোমা হাজরার ঘরটা দেখব।

—আসুন।

কিন্তুসোমা হাজরার ঘরে ঢোকায় বাধা পড়ল। সে ঘরটা প্রাসাদের পশ্চিমপ্রান্তে, একান্তে। ঘরের দরজা দু-পাশ্চার, সেগুনকাঠের রেইজড-প্যানেল পাশ্চার। তাতে গোদরেরের তালো নেই। দুটি পিতলের কড়ায় ঝুলছে একটা মোক্ষম নবতাল। তদুপরি হ্যাস্প বোল্ট-এ আর একটা মজবুত চাইনিজ লক! দস্তুর বললেন, এ তালার ডুপ্লিকেট চাবি আমার রিঙে নেই দেখছি। মনে হচ্ছে, সোমা নিজেই এই দুটি তালো কিনে এনে লাগিয়েছে।

বাসু বললেন, তাহলে আপনার ড্রাইভারকে ডাকুন। গাড়ি থেকে টুল-বক্সটা নিয়ে আসুক। তালো দুটো এখনি ভাঙতে হবে। তাছাড়া নিচে খবর পাঠান—ওরাও চলে আসুক। সর্বসমক্ষে তালো দুটি আমি ভাঙতে চাই।

দস্তুর বললেন, আজ বিকালেই কিন্তু মিস্ হাজরা ফিরে আসবে।

—আই ডোন্ট কেয়ার! আধঘণ্টার ভিতর তালো দুটি ভেঙে ফেলতে হবে।

তাই হল। ওঁরা বৈঠকখানায় গিয়ে আবার বসলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই দস্তুরের সেক্রেটারি—পামেলা নন, ইনি পুরুষ—এসে খবর দিলেন তালো দুটি ভাঙা হয়েছে: কিন্তু হ্যাস্প-বোল্ট বা হুড়কো এখনো খালো হয়নি।

ওঁরা উপরে উঠে এলেন। বাসু স্বহস্তে হুড়কো সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছোট ঘর। দুটি জানলাই বন্ধ। একটা সিংগল বেড খাট। ড্রেসিং টেবিল। খান দুই চেয়ার। একটা ক্যানভাসের ইজিচেয়ার, ওপাশে দেওয়াল ঘেঁষে গোদরেরের স্টিল-আলমারি। খাটের উপর বিছানার চাদর মেঝে পর্যন্ত লুটানো।

সেটা তুলে দেখা হল। নিচে খান-দুই স্যুটকেস। তালাবন্ধ।

বাসু জানতে চান, ওই স্টিল-আলমারিটা কার? আপনার না সোমা হাজরার?

—আলমারিটা হাউস-প্রপার্টি। কিন্তু ভিতরে বোধহয় রাখা আছে সোমার কাপড়

জামা। আমি ঠিক জানি না। কলি অথবা পামেলা থাকলে বলতে পারত।

—ওর চাবি আছে আপনার কাছে?

—ঠিক জানি না। চাবিটা ছিল ‘কলি’র কাছে। সে হয়তো সোমাকে দিয়েছে। তবে এর ডুপ্লিকেট হয়তো দীর্ঘদিন আমার কাছেই অব্যবহৃত পড়ে আছে।

—লেট্‌স্‌ সি।

—কিন্তু কাজটা কি ঠিক হবে? সোমা তো আজ সন্ধ্যাতেই...

কথাটা শেষ হল না। বাসু এগিয়ে এসে ওঁর হাত থেকে চাবির গোছটা কেড়ে নিয়ে দস্তুরের সেক্রেটারিকে দিলেন। বললেন, প্লিজ ট্রাই টু ওপন আপ।

দু-তিনটি থোকায় ত্রিশ-চল্লিশটা চাবি। ভদ্রলোক একটার পর একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যান। নিখিল অস্ফুটে প্রশ্ন করে, ওর ভিতরে আপনি কী খুঁজতে চাইছেন, স্যার? কী থাকতে পারে ওই আলমারির ভিতর?

—দ্য লাস্ট পীস্‌ অব দ্য জিগ্‌স্‌ পাজল। সেই চাঁপা রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়িখানা—যেটা পরে কলি এ বাড়ি ছেড়ে যায়।

নিখিল প্রতিবাদে কী একটা কথা বলতে যায়। তার আগেই দরজার কাছ থেকে শোনা যায় মহিলা কণ্ঠে একটা আর্তনাদ : একি? একী? এ আপনারা এখানে কী করছেন? তালা ভেঙে আমার ঘরে ঢুকে...

সবাই এপাশ ফিরে দেখেন দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সোমা হাজরা। তার কাধে একটা শান্তিনিকেতনী বোলা ব্যাগ। আর কী আশ্চর্য! তার পবিধানে চাঁপা রঙের একটা মুর্শিদাবাদী শাড়ি!

বাসু বলে ওঠেন, দেয়ার য়ু আর!

তারপর সুজাতা আর কৌশিকের দিকে ফিরে বলেন, কী হে ‘সুকৌশলী’? চাঁপা-রঙের মুর্শিদাবাদী শাড়ি নাকি বাজারে বিক্রি হয় না।

ঠিক ওখান দস্তুরের সেক্রেটারির হাতের চাপে আলমারির হ্যান্ডেলটা ঘুরে যায়। তিনি বলে ওঠেন, খুলে গেছে, স্যার!

সোমা হাজরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিতে যায়। তাকে রুখে দেয় নিখিল। বলে, প্লিজ ডোনট অবস্ট্রাক্ট আস। আলমারির ভিতর কী আছে আমাদের দেখতে দিন। আপনার সামনেই আমরা তা দেখব।

—না, না, না! তা আপনারা পারেন না। আগে সার্চ ওয়ারেন্ট না করিয়ে আমার ঘরের ভিতরেই আসতে পারেন না।...

বাসু বলেন, কারেক্ট! আন্ডার সেকশান, 442 অব ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অনধিকার প্রবেশ! তাছাড়া তালাভাঙা, আন্ডার সেকশান 445 অব I. P. C

সোমা ঘুরে দাঁড়ায় বাসু-সাহেবের মুখোমুখি। গলায় বিষ ঢেলে বলে, আপনি, আপনিই যত নষ্টের গোড়া। আপনি নিজেকে কী ভাবেন বলুন তো? শাহ-য়েন-শাহ! বাদশাহ? যা ইচ্ছে করবেন?

বাসু-সাহেব একটি ছদ্মকুর্নিশ করে বলেন, জী নেহী জাহানারা বেগম-সাহেবা। বান্দা তো হাঁয় হুজুরাইনকী নফর!

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠে ইন্সপেক্টার নিখিল দাশ।

—কী? কী বললেন? জাহানারা বেগম-সাহেবা?

—ইয়েস ইন্সপেক্টার দাশ! নেড়া কাশেমের সাগরেদ জাহানারা বেগম কুয়েত, বা দুবাই চলে যাননি। দস্তুর-প্যালেসে চাকরি নিয়েছিল কলির কম্পানিয়নের পরিচয়ে! ঠিক দু-বছর আগে।

সোমা হাজরা চিৎকার করে ওঠে, কে? কে জাহানারা বেগম? আপনি...আপনারা...

বাসু ডান হাতটা তুলে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেন। বলেন, একটি কথাও বল না সোমা! যতক্ষণ না তোমার পক্ষের সলিসিটর উপস্থিত হচ্ছেন। সে কম্পিটিটিউশনাল রাইট তোমার আছে। কারণ নিখিল তোমাকে অ্যারেস্ট করছে একটা মারাত্মক চার্জে : এইডিং অ্যান্ড অ্যাবেটিং আ ফাস্ট ডিগ্রি মার্ডার!

নিখিল নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। সোমা হাজার হাতে পরিয়ে দেয় স্টেনলেস স্টিলের একজোড়া বাল। আলমারির হ্যান্ডেল ঘোরানো গিয়েছে আগেই। নিখিল কারও অনুমতির অপেক্ষায় থাকল না। টেনে খুলে দিল আলমারির পাল্লটা। সামনেই জড়ো করে রাখা একটা কালো শিফনের শাড়ি-জ্যাকেট।

সোমা দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে একটা চেয়ারে।

তেরো

আধঘণ্টা খানেক হল ওঁরা নিউ আলিপুরের ডেরায় ফিরে এসেছেন। নিখিল আসেনি। সে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী কাকলিকে নিয়ে আসতে। বলে গেছে, আমাদের দুজনের আজ রাতে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ। মামিমাকে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করতে বারণ করবেন। আমি সাত-আট প্যাকেট চিকেন বিরিয়ানি আর মাংস নিয়ে আসব। ডিনার খেতে খেতে শুনব : কী করে আপনার জিগ্‌স পাজলটার সমাধান হল। বাই দ্য ওয়ে স্যার—আপনি রাতে কী খাবেন?

—জানি না। তোমার মামিমা আজ আমার জন্য কী বরাদ্দ করেছেন। বোধকরি

দুধ-সাবু!

—না, স্যার! আজ একটা ডে-অব-এক্সেসপশান। আপনিও থাকেন চিকেন বিরিয়ানি। কিচ্ছু হবে না। আমি মামিমাকে বলব।

—দেখ, যদি পুলিশের হুমকিতে সে রাজি হয়।

ও বাড়িতে মূল ঘটনার যবনিকা পড়ে গেছে। জাহানারা মেয়াদ খেটেছে, তার ফিঙ্গার-প্রিন্ট লালবাজারে সম্বন্ধে সংরক্ষিত। তাছাড়া তার আলমারির ভিতরে সিক্রেট-ড্রয়ার থেকে আবিস্কৃত হয়েছে কমলকলির যাবতীয় গহনা—পান্নাবসানো নেকলেসটা বাদে অবশ্য। নেড়া কাসেম বোধহয় ভেবেছিল—পুলিশ কলকাতা শহরের হাজারটা বাড়িতে তল্লাসি করলেও শুধু ‘দস্তুর প্যালেসে’ করবে না। গোদরেজ আলমারির চাবিটা কমলকলি অনেকদিন আগেই দিয়েছিল সোমাকে—ওই আলমারিটা ব্যবহার করতে। নিখিলের ব্যবস্থাপনায় সোমা হাজারা ওরফে জাহানারা বেগমকে জেনানা হাজতে অপসারিত করা হয়েছে।

বাসু-সাহেব এ কেসে কোনও ফী নিতে অস্বীকার করেছেন। বলেছিলেন, আমি মূলত ডিফেন্স কাউন্সেলার। নিরপরাধ আসামীকে বাঁচানোই আমার ধর্ম। এ ক্ষেত্রে আমি স্বধর্মচ্যুত হয়েছি। প্রসিকিউশনের তরফে কাজ করেছি। কলি-মায়ের প্রাণটা তো ফেরত দিতে পারব না। সুতরাং...

দস্তুর জনান্তিকে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি প্রকারান্তরে আমার মনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। আমার মেয়েকে কলঙ্কমুক্তা করেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, কলির মৃত্যুর পর তার চাবির থোকাটা সোমার হেপাজতে এসে যায়। সন্দেহটা বিক্রমজিতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সোমাই ওই চিঠিখানা কলির ড্রয়ারে রেখে দেয়।

—তা হোক! এক্ষেত্রে আমি কোন ফি নেব না।

কৌশিক সূজাতাও জোড়হস্তে বলেছিল, প্লিজ স্যার! আমরাও এক্ষেত্রে কিছু নিতে পারব না।

রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ বিরিয়ানি পোলাওয়ার একগাদা প্যাকেট নিয়ে নিখিল সস্ত্রীক এসে উপস্থিত হল। সবাই জমিয়ে বসলেন ড্রইংরুমে। নিখিল বলে, এবার বলুন, স্যার, কী করে বুঝলেন? প্রথমে বলুন, সোমা হাজারাকে প্রথম কখন সন্দেহ করতে শুরু করেন?

—যখন সে বেমক্লা আমাকে প্রশ্ন করে বসল : ‘দিদি সেদিন কীবকম ড্রেস পরেছিলেন জানেন?’ ফর আ সপ্লিট সেকেন্ড আমার মনে প্রশ্ন জাগল—এ কথা ও জানতে চাইল কেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ‘হ্যাঁ, শুনেছি। একটা চাঁপা-রঙের বেনারসী।’ দেখলাম, ও দৃঢ় প্রতিবাদ করল। উইথ গান্টো সে প্রমাণ করতে

চাইল—না, চাঁপারঙের বেনারসী নয়, কালো শিফন শাড়ি। আমার মনে প্রশ্নটা বারবার উঠছিল—কেন? কেন? কেন? আমি ভেবে দেখলাম—আমাদের পরিচিত ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র সোমা হাজরাই জানে যে, ‘সি’ কুপেতে কমলকলি একা যাচ্ছে দশ লাখ টাকার গহনা নিয়ে। সে নিজেই যদি খুনটা করে তাহলে তার প্রথম কাজ হল টাইম ফ্যাকটারটাকে গুলিয়ে দেওয়া। কিন্তু একা হাতে সে খুনটা করতে পারে না। যদি কেউ তার সহকারী থাকে তাহলে পারে। সুযোগমতো সে ক্লোরোফর্ম ভেজানো রুমালটা চেপে ধরবে কলির নাকে। ওর সহকারী ধরে থাকবে কলির হাত দুটো। কলি অজ্ঞান হয়ে গেলে দুজনে কাজ হাসিল করে লাসটাকে বেঞ্চির নিচে চালান করে দেবে। আমার মনে হল তা যদি ঘটে থাকে তাহলে ওরা সেটা করেছে খড়াপুর বালাসোরের মাঝামাঝি—অ্যারাউন্ড বেলা সাড়ে বারোটা থেকে একটা নাগাদ। সেক্ষেত্রে বালাসোরে ওর সহকারী অর্থাৎ নেড়া করিম কলির মালপত্র নিয়ে নেমে যায়। ক্লোরফর্ম জমা দেয়। সোমার কাছে ছিল ওই কালো শিফন শাড়ির ডুপ্লিকেট সেট। ইন ফ্যাক্ট সে নিজেই কমলকলিকে ওই স্ট্রাইকিং পোশাকটা বেছে দেয়। দুটি কারণে—যাতে ফর্সা কমলকলি একটা কম্পিকুয়াস চটকদারী ফিগার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ওর নিজের কাছে একটা ডুপ্লিকেট শিফন শাড়ির সেট আছে...ডেডবডি বেঞ্চির নিচে পাচার করে নেড়া করিম যখন বালাসোরে নেমে গেল তখন ‘সি’ কুপের দরজায় ছিটকিনি দিয়ে পোশাক বদলিয়ে সোমা বসল জানলায়। ভদ্রক স্টেশনে সে ম্যাগাজিন ভেঙারকে ডেকে টাকা-পাঁচিশের পত্রিকা কিনে পঞ্চাশটাকা দিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য : ভেঙারটা যাতে ফার্স্টক্লাস কুপেতে একজন কালো শিফন পরা ফর্সা মহিলাকে মনে রাখতে পারে। তার রূপযৌবন, বা গা দেখানো কালো শিফন শাড়ির জন্য না হলেও ওই পঞ্চাশটাকার নোট দিয়ে ভাঙানি না চাওয়ায়। সোমাই গোলাপী কংজে প্রেমপত্র দুটি লেখে। একটি রেখে দেয় কলির ড্রয়ারে—চাবি তার কাছেই ছিল কলির মৃত্যুর পর। দ্বিতীয়টা ট্রেনের কামরায় ওর ভ্যানিটি ব্যাগে। কলির টেলিফোন রেকর্ডারটারে ‘অলি’ এন্ট্রিটাও তারই করা।

নিখিল জানতে চায়, তাহলে সে নামল কখন? কোথায়?

—সম্ভবত ভদ্রকের পরের স্টেশনেই—যাজপুর কেওনবাড়ি। হত্যাকাণ্ডটা যে ভদ্রকের পবে হয়েছে—অর্থাৎ সোমার জবানবন্দি হিসাবে সে নিজে বালাসোরে নেমে যাবার পর—এটা এসট্যাবলিশ করতে মার্ডার ওয়েপনটা সে ছুঁড়ে ফেলেছিল বিটুইন ভদ্রক অ্যান্ড যাজপুর।

কৌশিক বলে, কিন্তু পোস্ট-মর্টেমে অটোপ্সি সার্জেন কেন বললেন মৃত্যুর সময় সাড়ে তিনটের আগে নয়? তিনি তো ভদ্রক স্টেশনে কমলকলিকে জীবিত দেখতে

পাওয়ার কথা জানতেন না!

—কারেক্ট। কিন্তু তিনি কীভাবে টাইম ফ্যান্টারটা স্থির করলেন? খুব সম্ভবত মৃতের পাকস্থলী এবং অস্ত্রে খাদ্যের জীর্ণতার সূত্র ধরে। পাকস্থলীতে তিনি যে খাদ্য পেয়েছেন তা থেকে বুঝেছেন : খাদ্যগ্রহণের তিন সাড়ে-তিন ঘণ্টা পরে পরিপাক যন্ত্র কাজ করা বন্ধ করেছে। কারণ লোকটা মারা গেছে। তিনি পুলিশের কাছ থেকে জেনেছেন যে কমলকলি লাস্ট মিল বা ব্রেকফাস্ট খেয়েছে খড়গপুরে। অর্থাৎ বারোটা সওয়া বারোটায়। সুতরাং তার তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে—বিটুইন ভদ্রক অ্যান্ড যাজপুর সে মারা গেছে। অটোপ্সি সার্জেনের বিচার নির্ভুল। কিন্তু বাস্তবে কমলকলি ব্রেকফাস্ট খেয়েছিল বেলা নয়টায়। বাড়িতে। ফলে তারপর তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা যোগ দিলে হয় বারোটা সাড়ে বারোটা।

সূজাতা প্রশ্ন করে, কিন্তু নেড়া করিম যে বেঁটে আর মোটা এটা আন্দাজ করলেন কেমন করে?

—খুব সহজে। হত্যাপর্যায়টা রূপেশ অথবা বিক্রমজিতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল সোমা। ও জানত না—কার কী জাতের ‘অ্যালোবাই’ আছে। তাই লোকটাকে খুব বেশি চিহ্নিত করেনি। তবে রূপেশ ও বিক্রমজিত দুজনেই রোগা ও লম্বা। আমার মনে হল যে, নেড়া করিমও যদি রোগা এবং লম্বা হয় তাহলে সোমা কিছুতেই ও কথা বলত না। সে বলত, ভদ্রলোক রোগা কি মোটা, লম্বা কি বেঁটে তা সে নজর করেনি। এ থেকেই আন্দাজ হল জাহানারা বেগমের সহকারী ছিল হয়তো মোটা আর বেঁটে!

এই সময়ে বিশেষ এসে জানালো দস্তুর-সাহেবের ড্রাইভার সাহেব এসেছেন। তিনি দেখা করতে চান।

বাসু বললেন আসতে বল তাকে।

লোকটা এসে স্যালুট করল। তার হাতে একটা বিগ শপার ব্যাগ। একটি খাম সে হস্তান্তরিত করল বাসু-সাহেবকে।

একই রকম খাম, একই রকম কাগজ। খামটা খুলে উনি পড়লেন :

প্রিয় ব্যারিস্টার-সাহেব,

পত্রবাহকের হাতে কয়েকটি জিনিস পাঠালাম :

1.A. কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে পান্না-বসানো (বিষদ বিবরণ-সহ) একটি নেকলেস প্রাপ্তির রসিদ।

1.B. ইন্সপেক্টর দাশের মিসেসকে আমি সেটা উপহার দিচ্ছি—এই মর্মে একটা স্বীকারোক্তি। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমি টেলিফোনে জানিয়ে

এক বৃন্তে দুটি কাঁটা—6

তার অনুমতি নিয়েছি।

2. কলির সেই কসম্যাটিক কম্প্যাক্টের বাকি গহনাগুলি। এগুলি আপনার নাতনির জন্যে আমার আশীর্বাদী। তার বিবাহের সময় আপনি-আমি হয়তো উপস্থিত থাকব না এটা তার বিবাহে আমার অগ্রিম আশীর্বাদ ও যৌতুক। কী জানেন বাসু-সাহেব? ওই গহনাগুলো এ-বাড়িতে রাখতে মন সরছে না। মর্মান্তিক দুঃখ বিজড়িত স্মৃতিচিহ্ন। যদি নিখিলবাবু ও কৌশিকবাবু মনে করেন এই অলঙ্কারগুলি অশুভ ও অভিশপ্ত তাহলে তাঁরা যেন গহনা ভেঙে নতুন করে গড়ে নেন। আমাকে যেন প্রত্যর্পণ না করেন। বাকি রইলেন আপনি নিজে এবং মিসেস বাসু-আপনার জন্য এক বোতল ‘রয়্যাল স্যালিউট’ পাঠালাম। দুঃখ ভোলাতে এমন ওষুধ আর নেই। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি! সবচেয়ে বড় কথা : আপনি ‘কলি’কে মিথ্যা কলঙ্ক থেকে মুক্ত করেছেন। আমাকে শান্তি দিয়েছেন। কন্যার স্মৃতির সঙ্গে কোনো ক্রোধ যুক্ত হয়ে রইল না।

মিসেস বাসুই একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যতীত আর কোন উপহার পাঠালাম না। সে ধৃষ্টতা দেখাবার স্পর্ধা আমার নেই। বিবাহসূত্রে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে যে রত্নটি উপহার দিয়েছেন, তার পর আর কোনো পার্থিব উপহার তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎ!

ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

ইতি

ভাগ্যহীন

জগৎপতি দস্তুর।”

হরিপদ কেরানির কাঁটা

গোপালপুর-অন-সী।

উড়িয়ার গঞ্জাম জেলায় বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই মনোরম সাগরবেলা। এককালে এই সমুদ্রতীর বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুব প্রিয় ছিল। সারা শীতকাল ‘গোপালপুর-অন-সী’ থাকত জমজমাট। পুরীর ভিড় নেই, পুরীসমুদ্রের সেই কাকে-খাই কাকে-খাই প্রচণ্ড ঢেউও নেই।

বেলাভূমির প্রায় দক্ষিণপ্রান্তে, মুষ্টিমেয় হোটেলের ঘেঁষাঘেঁষি জটলা থেকে যেন একটু স্বাভাব্য বজায় রেখে দুর্গের মতো মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিলাতী-কেতার হোটেল—‘দ্য নুক’। হোটেল-মালিক—না মালিক নয়, মালকিন, মিসেস নোয়ামি ক্রেগম। প্রায় আশি ছুঁই ছুঁই বিধবা। ওঁর স্বামী ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক জাঁদরেল অফিসার। বিশাল প্রাসাদটি বানিয়েছিলেন অবসর নেবার আগেই, কিন্তু ভোগ করে যেতে পারেননি। বাড়ি শেষ করতে করতেই ওপার থেকে ডাক এসে গিয়েছিল প্রৌঢ় মানুষটির। নিঃসন্তান নোয়ামি হোটেলটার শেষ রূপারোপ করেছিলেন। লিজাকে ম্যানেজার বানিয়ে এই পাছাবাসটি চালু রেখেছেন। লিজা ওঁর স্বর্গগতা ভগিনীর নাতনী। কনফার্মড স্পিনস্টার।

সমুদ্রমুখী দ্বিতল বাড়ি। প্রতিটি ঘর থেকেই জানলা দিয়ে সাগরসৈকতের দৃশ্য নজরে পড়ে। হোটেলের সামনে, ক্যানিউটের আদেশ লঙ্ঘন করে অথচ ভরা-কোটালের লক্ষ্মণের দেওয়া গুঁর সীমারেখা স্বীকার করে সমুদ্রের জল যতদূর আসে তার থেকে প্রায় বিশ-মিটার ভিতরে সারি-সারি অনেকগুলি বিরাটাকার রঙিন ছাতা খাটানো। সেগুলির কাছাকাছি ইতস্তত ছড়ানো কিছু আরামদায়ক প্লাস্টিকের চেয়ার। সবই সমুদ্রমুখী এবং খালি। যেগুলি ভর্তি তাতে যারা বসে আছেন তার অধিকাংশই আমাদের পরিচিত। সপরিবারে বাসু-সাহেব আর ব্রজদুলালবাবু।

ব্রজবাবুকে মনে আছে তো? ড্রেস-রিহার্সালের কাঁটার? তাঁরই ব্যবস্থাপনায় ও আশ্রয়ে এবার পুরীর বদলে এই গোপালপুরে অভিযান। ব্রজদুলাল অকৃতদার, একা মানুষ। অগাধ সম্পত্তি। গতবছর অল্পসময়ের ব্যবধানে তাঁর তিন-তিনটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর

অপমৃত্যু ঘটেছে। বিল শবরিয়া আর ডাক্তার ঘোষাল মারা গিয়েছিলেন বিষপ্রয়োগে আর একজন নিকটবন্ধু ফাঁসিকাঠে ঝুলে। সেসব কথা বিস্তারিত বলা হয়েছে ‘ড্রেস রিহাসার্সালের কাঁটা-য়। ব্রজদুলাল তারপর তাঁর শ্যামবাজারের থিয়েটার হাউসটি বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। মেলাঙ্কোলিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারে হাওয়া বদলের কথা বলেছিলেন। ওঁর নিজস্ব একটা ফাঁকা বাড়ি পড়ে আছে পুরীতে, কিন্তু সেটা যেন অভিশপ্ত। স্মৃতিবিজড়িত, ক্ষুধিত পাষণ। তাঁর প্রকাণ্ড গাড়িটা নিয়ে তাই চলে এসেছেন এই গোপালপুর-অন-সীতে। সপরিবারে বাসু-সাহেবকেও পাকড়াও করে নিয়ে এসেছেন দিন-দশেক ছুটি কাটিয়ে যেতে। হোটেলের রিজার্ভেশান থেকে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে দেওয়া সব কিছু করেছে ওঁর একান্ত সচিব অশোক। সে নিজে অবশ্য ফিরে গেছে। ওই প্রকাণ্ড গাড়িতে সড়কপথে আসায় রানী দেবীর হুইল-চেয়ারটা আনতে কোনও অসুবিধা হয়নি।

সকালবেলা প্রাতরাশ সমাধা করে ওঁরা সার বেঁধে বসেছেন সমুদ্রের কিনারে। রানী দেবীর হাতে কী একটা মাসিক পত্রিকা। কিন্তু এক পাতাও পড়া হয়নি। একে সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়া, তায় প্রতিনিয়তই কানে ভেসে আসছে আশপাশের কথাবার্তা। পত্রিকাটা মুড়ে রেখে পার্শ্ববর্তিনী সুদীপাকে বললেন, গোপালপুর কিন্তু পুরীর তুলনায় অনেক শান্ত।

চল্লিশ ছুই-ছুই অনুঢ়া সুদীপা বলে, সমুদ্রের শান্ত রূপটা ভালই লাগে। এখানে সাহস করে স্নান করা যায়। পুরীর ডেউগুলো সবাই যেন দারা সিং। সুযোগ পেলেই ঠাং ধরে পটকে দেবে। কপাল কেটে যায়, হাঁটু ছড়ে যায়। পুরীর সমুদ্রকে খুরে খুরে পেল্লাম। আমি তো বাপু পুরী গেলে ভুলেও জলে নামি না। এখানে দিব্যি রোজ স্নান করছি।

পায়েল, সুদীপার বাঙ্কবী—ওরা একই স্কুলে পড়ায়, কলকাতায়,—গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ায় একটা ডব্ল-বেড রুম বুক করে একসঙ্গে আছে—বললে, সমুদ্র নিয়ে আমার কোনো কম্প্লেন নেই ; কিন্তু এতটা নির্জনতা যেন বরদাস্ত হয় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন খালি খালি লাগে।

প্রৌঢ় কর্নেল সমাদ্দার বসেছিলেন অদূরে। এদিকে ফিরে বললেন, বটেই তো। সুটকেস ভর্তি যেসব জমকালো শাড়িগুলো এনেছেন তা পরে সী-বীচে পায়চারি করা বেহুন্দো। দেখবে কে? দেখেনাবালা কই?

সবাই হেসে ওঠে। সুদীপা জানে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা এসব ক্ষেত্রে : প্রতি-আক্রমণ। বাঙ্কবীকে সাহায্য করতে তাই বলে, কেন? দেখবেন তো আপনি। একমাত্র আপনিই তো জানেন, লক্ষ্য করে দেখে রেখেছেন : কোন মহিলা একই শাড়ি পরে

দু'বেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন, কার শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ ঠিক ম্যাচ করেনি। তাই তো অভাবড় একটা বাইনোকুলার নিয়ে এসেছেন কলকাতা থেকে।

কর্নেল একটু ঘাবড়ে যান। বলেন, না, না। এটি আমার নিত্য সহচর। সার্ভিস যুগের বাইনো।

—আই নো।—প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে যায় সুদীপা। এককালে ওইটার সাহায্যে শত্রুদের গোপন অবস্থান খুঁজতেন, এখন অবসর নেবার পর সুন্দরীদের গোপন অবস্থানের সন্ধান করেন। বিশেষ করে বহুদূরে যারা সমুদ্রে স্নানরত।

রানী দেবী ঋগড়া-কাজিয়া থামিয়ে দেবার চেষ্টা করেন : তোমরা অহেতুক ওঁর লেগপুলিং করছ, সুদীপা আর পায়েল। আর আপনিও বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কর্নেল সাহেব, এতটা নির্জনতা কী আপনারই ভাল লাগে? তাছাড়া ত্রিসীমানায় কোনো শপিং সেন্টার পর্যন্ত নেই যে, দু'দণ্ড সময় কাটাতে পারে মেয়েরা।

কথাটা লুফে নেয় অর্পিতা : বলুন তো মাসিমা। বেড়াতে এসে যদি শপিংই না করলাম তাহলে...

কৌশিক চট্জলদি পাদপূরণ করে, 'ডেংচি-বিবি' বন্ব কী করে?

—'ডেংচি-বিবি' মানে?

কৌশিক শাংকর-ভাষ্য দাখিলের সময় পায় না। কারণ সেই মুহূর্তেই সামুদ্রিক বাতাসে মিশ্রিত হলো ফরাসি সেন্টের একটি উগ্র সৌগন্ধ। সকলেই হোটেলের প্রবেশদ্বারের দিকে তাকালেন—মানে তাকাতে বাধ্য হলেন। সদর-দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছেন একজোড়া কপোত-কপোতী। কর্তার উর্ধ্বাঙ্গে প্রকাণ্ড একটা তোয়ালে, কাঁধে ব্যাগ, নিম্নাঙ্গে নীলরঙের সুইমিং-ট্রাংক। বলিষ্ঠ লোমশ জানুদ্বয়ের আ-প্রাইভেট-পার্টস্ অনাবৃত। কপোতীর পোশাক আরও বিচিত্র। তোয়ালের বালাই নেই। শ্রেফ রানী কালার 'বিকিনি'। শ্যামলা গায়ের রঙ, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠব অনিন্দ্য। এই জাতীয় কোনো নায়িকাকে দেখেই বোধহয় কালিদাস তাঁর সেই দিলতোড় 'তরী-শ্যামা' শ্লোকটা রচনা করেছিলেন। কারণ 'বিকিনি' পরিধান করায় দেখা যাচ্ছে এঁরও 'নামিতা নিম্ননাভি'; ইনিও 'শ্রোণীভারাদলসগমনা' এবং বরাসের 'ভ্যাংদ্রয়' স্তোকনন্দ্য। না হবে কেন? বয়স তো বহুদিন দেড়কুড়ি অতিক্রম করেছে।

কৌশিক উর্ধ্বমুখে একটি দার্শনিক স্বগতোক্তি ছেড়ে দেয় : সম্ভবত এঁরা দুজন সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহেরই বাসিন্দা, ই. টি. নন।

অর্পিতা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, ই. টি মানে?

—একস্ট্রা টেরিস্টিয়াল জীব। ওই যাঁরা মাঝে-মাঝে ফ্লাইং ডিস্কে চেপে

খেয়ালবশে আমাদের সঙ্গে মূলাকাং মানসে পৃথিবীতে আসেন।

কর্নেল সাহেব বলেন, ওঁরা কাল একটু বেশি রাত্রে এসেছেন। আমি লাউঞ্জে বসে তখন একাই থার্ড পেগ্‌ ড্রাই-মার্টিনীটা শেষ করছি। ভদ্রমহিলাটিকে চেনা-চেনা মনে হলো ; কিন্তু ঠিক—

পায়েল নিরীহের মতো প্রশ্ন করে, ভদ্রমহিলা কি তখনো ওই ‘বিকিনিটা’ পরেই ছিলেন?

সুজাতা বলে, স্টপ্‌ য়োর কন্টিনিউয়াস্‌ লেগপুলিং, পায়েল। আপনারা কি এই নবাগত দম্পতিকে সত্যিই চিনতে পারেননি?

সুদীপা বলে, আমি পেরেছি। এঁরা চিনতে পারছেন না ওঁর গাত্রবর্ণের জন্য। মেকআপ-ম্যানের সেই দুধে-আলতা রঙের প্রলেপটা তো এখন নেই। উনি হচ্ছেন, টলিউডের মোস্ট ফেমাস নায়িকা—পর পর তিনটি বক্স-অফিস বিদীর্ণ করা নবাগতা আর্টিস্ট : অনামিকা সেন।

—‘সেন’? না ‘ঘোষাল’? জানতে চায় পায়েল।

সুদীপা বলে, আমি ওঁর ‘ম্যারিটাল-হিস্ট্রি’ নিয়ে গবেষণা করিনি। এটুকু শুনেছি যে, বেশ কয়েকবার উনি বিবাহ করেছেন, কিন্তু প্রথম অভিনয় কালে যে উপাধিটা ছিল—‘সেন’—সেটি পরিবর্তন করেননি।

একটু দম নিয়ে সুদীপা আবার বললে, এটি শুধু চতুর্থ স্বামী : সোমেশ্বর ঘোষাল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাস-তিনেক। এটা ওদের ‘হিম্মুন ট্রিপ’ নয়, সে বথেড়া মিটেছিল কাঠমণ্ডুতে।

সুজাতা বলে, ওরে বাবা। তুমি ওদের বিষয়ে এত নাড়ির খবর পেলে কোথেকে?

পায়েল সমাধান দাখিল করে, সুদীপা স্কুলে বাঙলা পড়ায়, আবার ফ্রি-ল্যান্স জার্নালিজম্‌ও করে। একাধিক সিনেমা পত্রিকায় লেখে।

অর্পিতা জানতে চায়, ওঁহ মিস্টার সোমেশ্বর ঘোষাল কী করেন?

—বর্তমানে ধর্মপত্নীর খিদ্‌মদ্‌গিরি। এককালে ডাল ফুটবলার ছিলেন। সিনিয়ার ডিভিসন টিমে ফরোয়ার্ডে খেলতেন।

অর্পিতা আবার জানতে চায়, কোন টিমে?

—এক-এক সিজ্‌নে এক-এক টিমে। কেন আপনি জানেন না, ফুটবল মরসুমের আগেই নামকরা ফুটবলাররা কোরাসে সেই বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতটা গাইতে থাকেন : ‘কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?’

ইতিমধ্যে হোটেল থেকে কিছুটা দূরে ‘খিদ্‌মদ্‌গার’ তার তোয়ালেটা বিছিয়ে

দিয়েছে। অনামিকা তার সর্বাস্থে ইতালিয়ান অলিভ-অয়েল বার্তোম্মি মর্দন করতে শুক করেছে।

এতক্ষণে এসে উপস্থিত হলো সমরেশ পালিত। সেও সুইমিং পুংক পরে এসেছে। সবাইকে সম্বোধন করে বলে, শুড মর্নিং এভরিবডি। আপনারা এখনো কেউ জলে নামেননি দেখছি। এরপর বালি যে তেতে উঠবে।

কর্নেল বলেন, আমরা তৈরি হয়ে নিতাম ; কিন্তু ইতিমধ্যে একটি বাধার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ স্থানত্যাগ করতে চাইছেন না।

সমরেশ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। স্ত্রী অর্পিতার দিকে ফিরে বলে, তুমি চট্ করে পোশাক-টোশাক বদলে এস। আমরা এখনই জলে নামব।—তারপর কর্নেলের দিকে ফিরে বলে, হ্যাঁ, কী-একটা বাধার কথা বলছিলেন যেন আপনি। কোনও হাঙর-টাঙর কি পথ ভুলে এ-পাড়ায় এসে পড়েছে?

অর্পিতা স্নানের পোশাক পরতে চলে গেল সমরেশের হাত থেকে চাবিটা নিয়ে। কর্নেল বললেন, আপনি বুলস-আই হিট করেছেন মিস্টার পালিত। হাঙর। না, হাঙর নয় : কিলার হোয়েল। ওই যাকে বলে : 'অর্কা', অর্থাৎ জ'স ছবির নামভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন।

সমরেশ বসেছিল কপোত-কপোতীর দিকে পিছন ফিরে। অভিনব দৃশ্যটা এখনো তার নজরে পড়েনি। বলে, হেঁয়ালিটা একটু ভেঙে বলবেন, কর্নেল সাব?

কর্নেল একটি ফোঁজি লব্জ্ ঝাড়লেন, সোলজার। 'বাউট টার্ন।

সমরেশ বুঝল। একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে বসল। তারপর সে যেন স্থানকালপাত্র ভুলে গেল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বসে পড়ল। অসঙ্কোচে টেনে নিল কর্নেল সাহেবের হাত থেকে তাঁব 8"x4" বাইনোকুলারটা। অসঙ্কোচেই চোখে লাগাল। যেন বজ্রাহত হয়ে গেছে সে।

ইতিমধ্যে তৈলমর্দনান্তে বাংলা ফিল্ম তথা সিরিয়ালের দিল্তোড় নায়িকা উবুড় হয়ে শুয়েছেন তোয়ালের উপর। সানট্যান্ড হবার বাসনা তাঁর। অগত্যা ছুটি পেয়ে ওঁর খিদ্দম্‌গার এদিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। তোয়ালেটা গাত্রচ্যুত হওয়ায় তার লোমশ দেহের নব্বই শতাংশই নগ্ন। যুক্তকরে সকলকে সমবেত নমস্কার করে বলে, শুড মর্নিং এভরিবডি। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন। আমরা দুজন কাল রাতে এসেছি। উঠেছি বাইশ নম্বর ঘরে। থাকব দিনসাতেক। আপনারদের কারও সাথে আমাদের আলাপ নেই। সেই কাজটা সারতেই উঠে এলাম। সর্বাগ্রে নিজের পরিচয়টা দিই। পিতৃদত্ত নাম : সোমেশ্বর ঘোষাল। এককালে ছিলাম : ফুটবলার। সিনিয়ার ডিভিশনে রাইট-হান্ড খেলতাম। এক শ্যালিকাপুত্র স্টপারের লেঙ্গিতে ডান

‘ফিমার বোনটা’ বল-সকেট জয়েন্ট থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা, হ্যাঁ পেনাল্টি পেয়েছিলাম। জিতেও ছিলাম। কিন্তু আমি আর ফুটবল ময়দানে ফিরে আসতে পারিনি।

কর্নেল বললেন, হাউ স্যাড।

—ইয়েস্ স্যার। ইটস্ দ্য ‘স্যাডেস্ট অফ অল’ ফাউল্‌স্ ইন মাই ফুটবলার্স কেরিয়ার। বর্তমানে আমি আমার ওই বেটার সেভেন-এইটথ্-এর খিদমদগারি করে গ্রাসাচ্ছাদন করি।

সমরেশ জানতে চায়, ‘বেটার সেভেন-এইটথ্’ মানে?

সোমেশ্বর বললে, আপনি বিবাহিত কিনা জানি না। হলে নিশ্চয়ই অস্থিতে-অস্থিতে অবগত আছেন : ‘বেটার হাফ’ কাকে বলে। বিবাহের সময় আমার উনি ছিলেন ‘বেটার থ্রিফোর্থ’। আমার পরিচয় ছিল অনামিকা সেনের ফুটবলার হাজবেস্ত। ল্যাংড়া হয়ে যাবার পর আমি হয়ে গেছি ‘ওয়ার্স-ওয়ান-এইটথ্’। উনি ন্যাচারালি ‘বেটার সেভেন-এইটথ্’। সে যাক্, আপনাদের পরিচয়গুলি সংগ্রহ করি—সাতদিন একত্রে থাকতে হবে যখন।

কর্নেল আগ্ বাড়িয়ে বলেন, সবার আগে আপনি বসুন। আমি হলাম ইন্ডিয়ান আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বিল্বমঙ্গল সমাদ্দার। একাই আছি একতলার 2/1-এ। ইনি স্বনামধন্য পি. কে. বাসু বার-অ্যাট্-ল। মিসেস বাসু। এঁরা দুজন—পায়েল আর সুদীপা একই ফুলে পড়ান। আছেন দোতলায়। এঁদের পাশের ঘরেই মিস্টার কৌশিক আর সুজাতা মিত্র। ওদের সঙ্গে একটি কিউট বাচ্চা...কী যেন নাম?

সুজাতা পাদপূরণ করে : মিঠু।

—হ্যাঁ মিঠু। আর ইনি ব্রজদুলালবাবু। এসেছেন একাই। এছাড়া আছে আর একটি কাপল—সমরেশ আর... ওই তো, নাম করতে করতেই এসে পড়েছেন ওঁর বেটার হাফ।

সুইমিং কস্টুমের উপর একটা হাউসকোট চাপিয়ে ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিতর থেকে এগিয়ে এল অর্পিতা।

সোমেশ্বর পর্যায়ক্রমে নমস্কার করে যাচ্ছিল। অর্পিতাকেও করল। অর্পিতা গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে একটা চেয়ারে বসল। সোমেশ্বর বললে, দেখুন, আমি শ্রুতিধর নই! এতগুলি নাম ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারব না। আপনাকে আমি কর্নেল-সাহেব, আর ওঁকে ব্যারিস্টার-সাহেব বলে ডাকব। ইনি ন্যাচারালি বাসু-মাসিমা। তাহলে তিনটি নাম মনে রাখার দরকার হবে না...

ঠিক সেই সময়ে তিন-চার মিটার দূরত্বে বালুশয্যালীনা অনামিকা মিহি গলায়

হাঁকাড় পাড়ে, ডার্লিং। একটু শুনে যাও প্লিজ...

সোমেশ্বর রওনা দেবার আগে বাসু-সাহেবের দিকে ফিরে বললে : আদালতের 'সমন', স্যার। আগে সেটা সেরে আসি। নাহলেই আদালত অবমাননা।

ব্রজদুলাল বলেন, ছোকরা খুব ফুর্তিবাজ। মুখে-চোখে কথা। তাই না বাসু-সাহেব?

—অন্তত সেই রকম একটা 'ইমেজ' তৈরি করার চেষ্টা করছে।—বাসু-সাহেবের মন্তব্য।

দূর থেকে দেখা গেল—অনামিকা ফ্লাস্কটা খুলতে পারছে না। সোমেশ্বর সেটা খুলে ওকে কিছু কফি ঢেলে দিয়ে আবার ফ্লাস্কটা বন্ধ করে দিল। ওরা নিম্নস্বরে কী যেন আলাপচারী করল। তারপর সোমেশ্বর এদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অনামিকা উঠে বসে। সমুদ্রের দিকে মুখ করে কফি পান করতে থাকে। এখন তার প্রোফাইল দেখা যাচ্ছে। সমরেশ নির্লজ্জের মতো আবার তুলে নিল কর্নেল সাহেবের চেয়ার থেকে তাঁর দূরবীনটা।

সোমেশ্বরের সেটা নজরে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে বাইনোকুলারের লক্ষ্যমুখটাও লক্ষ্য করল। অনামিকা এতক্ষণে সামনে ফিরেছে। তারিয়ে তারিয়ে কফি পান করছে। সোমেশ্বর রসিকতা করে সমরেশের কাঁধে একটা হাত রাখল। সমরেশ চমকে বাইনোটো নামিয়ে নিতেই সোমেশ্বর বলে, আপনি যা ভাবছেন তা নয়, ওগুলো স্লাইপ নয়, স্যান্ডপাইপার। স্লাইপ সুস্বাদু, কিন্তু স্যান্ড-পাইপারের মাংস অখাদ্য।

সমরেশ রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে বলে, স্যান্ডপাইপারই হবে বোধহয়।

বাইনোটো ফেরত দেয়। সকলেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসে। সোমেশ্বর বলে, এতক্ষণে সবার গলাই নিশ্চয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। আমাকে এক-রাউন্ড ড্রিংস-পরিবেশনের অনুমতি দিন। বলুন কে কী নেবেন? কর্নেল সাহেব?

—বীয়র। যদি মাছরাঙা পাওয়া যায়। না হলে ব্ল্যাক লেবেল।

বাসু-সাহেব এত সকালে কিছু নিতে রাজি হলেন না। মিসেস বাসু—কোক ; ব্রজদুলালও বীয়র ; কৌশিক চাইল ভদ্রকা উইথ ক্যানাডা-ড্রাই।

সোমেশ্বর দুই দিদিমণির দিকে ফিরে বলল, আপনারা দুজন?

দুই বান্ধবীর চোখাচোখি হ'লো। সুদীপা বলল, যা হোক দুটো সফ্ট্ ড্রিংস।

সোমেশ্বর বলে, 'জিন-অ্যান্ড-লাইম'ও কিন্তু লেডিজ ড্রিংক। এক পেগে কিছু নেশা হবে না। আর এখানে ছাত্রীরা তো কেউ নেই। অসুবিধাটা কোথায়?

পায়েল স্বীকার করল, আমি জীবনে কখনো খাইনি কিন্তু।

সোমেশ্বর বলে, তবে জন্মের শোধ এখানেই পরীক্ষাটা করে ফেলুন। আই স্ট্যান্ড

গ্যারান্টি। এক পেগে কোনও নেশা হবে না। হয় না।

সমরেশ বলল, আমারও তাহলে ওই ‘জিন-অ্যান্ড-লাইম’।

সোমেশ্বর অর্পিতার দিকে ফিরে বলল, আপনি কি নেবেন, মিসেস্ পালিত?

—আমি একটা সফট নেব : কোক্।

কৌশিক উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনি নিজ স্বীকৃতিমতে ঋতিধর নন। সব গুলিয়ে ফেলবেন। চলুন, আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

ওরা দুজনে সবে ‘বার’-এর দিকে গেছে এমন সময় সামুদ্রিক হাওয়ায় ভেসে এল একটা সকাতর আহ্বান : ডার্লিং। কৌটোটা খুলতে পারছি না।

বলে, অনামিকা এদিকে ফিরল। ভিড়ের মধ্যে সোমেশ্বরকে চিহ্নিত করতে চাইল। চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে। এতক্ষণে বোঝা গেল, কালিদাসের সেই দিলতোড় শ্লোকের ওই বিশেষণটাও মিলে যাচ্ছে : ‘চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা’—তা হোক না বয়স, হিসাব মতো দেড়কুড়ি।

সমরেশ আবার শরাহত। সম্মোহিতের মতো সে উঠে দাঁড়াল। অনামিকা তার দিকে তাকিয়ে ভুবনজয়ী একটুকরো হাসি ছুঁড়ে দিল। তারপর কিশোরী মেয়ের মতো আদুরে গলায় বললে : এই ক্রিমের কৌটোটা। কিছুতেই খুলতে পারছি না।

সমরেশ হস্তদস্ত হয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। বসে পড়ল ওর বিছানো তোয়ালের পাশে, বালিতেই। এদিকে কর্নেল-সাহেব ততক্ষণে বাইনোর ফোকাসিংটা রি-অ্যাডজাস্ট করে রানিং কমেস্টি শুরু করেছেন : ক্রিমের কৌটোটা সত্যিই আটকে গেছিল কিনা খোদায় মালুম। এখন সেটা খোলা গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে শুধু টিনের কৌটো নয়, আরও কিছু উন্মোচনের আগ্রহ নিয়ে উনি ও-পাড়ায় গেছেন। দুজনে সে বিষয়ে আলাপচারী হচ্ছে...

রানী বলেন, আপনি থামুন তো কর্নেল-সাহেব। আমরা ওই দৃশ্য দেখতে এখানে এসে বসিনি।

—আই নো, আই নো। কিন্তু বাইনোতে তো সী-গাল, স্লাইপ, স্যান্ডপাইপার কিছুটি দেখতে পাচ্ছি না—শুধু একজোড়া চখা-চখী।

অর্পিতার আর সহ্য হয় না। চিৎকার করে ওঠে, সমর। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। চল এবার জলে নামি।

অতদূর থেকে সমরেশ জবাব দিল, তুমি নাম, আমি এখনি আসছি।

কর্নেল রানিং কমেস্টি চালিয়েই যাচ্ছেন : এই ক্রিমটা বোধহয় পিঠে মাখতে হয়। নিজে নিজে মাখা যায় না। তাই একটা হেল্পিং হ্যান্ড...

কথাটা অসমাপ্ত রইল। কারণ সেই সময়েই একটি বার-অ্যাটেন্ডেন্ট-এর হাতে

দেতে সুরাপাত্র সাজিয়ে ফিরে এল ওরা দুজন। পরিবেশন শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ‘চিয়াস’ বলে কেউ চুমুক দিল না। সোমেশ্বরের প্রতিক্রিয়ার জন্য সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। সোমেশ্বর তাকিয়ে দেখল। অনামিকা উবুড় হয়ে পড়ে আছে। আর তার পিঠে সমরেশ ওই ক্রিমটা মালিশ করে দিচ্ছে। সোমেশ্বর নির্বিকার। কোনও ভাবান্তর হলো না তার। কর্নেল-সাহেব তাকে বললেন, আপনার বেটার সেবেন-এইটুথ আপনাকে একটু আগে খুঁজছিলেন।

‘চিয়াস’ বলে সোমেশ্বর তার হুইস্কিসোডায় একটা চুমুক দিল। হ্যাঁ, এত সকালেও সে হুইস্কি পানে অভ্যস্ত। বললে, বুঝেছি। ওই ক্রিমটা ওর পিঠে মাখিয়ে দেবার জন্য। এ আমার নিত্যকর্মপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। তা নতুন খিদমদ্গার তো ও আজ পেয়েই গেছে। আমার ছুটি।

অর্পিতা গট্-গট্ করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। হাঁটুজলে নেমে আবার একটা হাঁকাড় দিল : সমর। আমি জলে নামলাম কিন্তু...

—ও. কে। আয়াম কামিং ইন আ মিনিট, ডার্লিং।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরের কথা। ইতিমধ্যে স্নানার্থীরা একে একে স্নান সেরে ভিতরে গেছেন। কৌশিক-সুজাতা, পায়েল-সুদীপা, কর্নেল সমাদ্দার প্রভৃতি। বাসু সমুদ্রস্নান খুব উপভোগ করতেন, করেনও ; কিন্তু গতবছর পুরীতে পরপর দু’দিন সমুদ্রস্নান করে সর্দিজ্বরে পড়েছিলেন। এবার তাই রানীর নির্দেশে তাঁর সাগরজলে নামা মানা। ব্রজদুলাল সমুদ্রস্নান পছন্দ করেন না। তাঁর আর্থারাইটিস আছে। সারা বছর তিনি গরমজলে স্নান করেন। অর্পিতা প্রায় আধঘণ্টা জলে ছিল। বেশ ভালই সাঁতার জানে সে। তটরেখা ছেড়ে মানুষভর-জল এলাকায় অনেকটা সাঁতরে ফিরল। মাঝে একবার ডাঙায় উঠে হাঁক পেড়েছিল তার কর্তার উদ্দেশ্যে : কী? তুমি আজ নাইবে। না—না?

সমরেশ রীতিমতো ভদ্রলোক। তার কথার নড়চড় হয়নি—এই এলাম বলে। জাস্ট আ মিনিট।

অর্পিতা রীতিমতো আহত হয়ে পায়ে পায়ে উঠে এল। ওঁদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে হোটেলের দিকে চলে গেল। ভিজা বেদিং-কস্টিউমের উপর একটা হাউসকোট চাপিয়ে। কেউ তাকে কিছু বলল না। সেও কোনও কথা বলল না। চরম অপমানিতা মনে হলো তাকে।

ছাতার তলা ছেড়ে ইতিমধ্যে বাসু সস্ত্রীক উঠে এসেছেন হোটেলের পোর্চ-এ। পোর্চটাও প্রকাণ্ড—ওভাল শেপড। অনেকগুলি কংক্রিটের বেঞ্চি। মাঝখানে খান-

কতক বেতের টেবল আর পোর্টেবল বেতের চেয়ার। তার একটি দখল করে হুইস্কি-সোডা, স্ন্যাকস্ আর বরফ নিয়ে জমিয়ে বসেছিল সোমেশ্বর। একাই।

অর্পিতা যখন পোর্চের সামনে দিয়ে নতমস্তকে ভিতরে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সোমেশ্বর। একটু এগিয়ে এসে ডাকল, মিসেস পালিত।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে অর্পিতা। গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল সোমেশ্বর : আপনাকে একটা কথা বলব, মিসেস্ পালিত ?

কুণ্ঠিত-প্র অর্পিতা বলল, না। দেখছেন না আমার সর্বাঙ্গ ভিজে। এই কি কথা বলার সময় ?

—ও আয়াম সরি। এক্সট্রিমলি সরি—

অর্পিতা তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে ভিতরে চলে যায়। সোমেশ্বর গ্লাসটা উঠিয়ে নিয়ে এদিকে এগিয়ে আসে। বসে ছিলেন শুধু বাসু-সাহেব আর রানীদেবী। আর রানীর কোলে ঘুমন্ত মিঠু। কৌশিক-সুজাতা জামা-কাপড় বদলাতে গেছে।

বাসু-সাহেব যে টেবিলে বসেছিলেন তার কাছেই ছিল আরও কিছু ফাঁকা বেতের চেয়ার। সোমেশ্বর বাসু-সাহেবকে বলে, একটু বসতে পারি, স্যার ?

বাসু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। ঘাড় না ঘুরিয়েই বললেন, বস। কিন্তু তুমি স্নানে যাবে না ?

—যাব বলেই তো সকাল থেকে তৈরি হয়ে আছি ; কিন্তু ক্রিয়ারেঙ্গ পাচ্ছি কই ? সিগ্নাল যে এখনো আপ।

বাসু-নীরব রইলেন। রানী অহেতুক মিঠুর পিঠে থাবড়া দিতে শুরু করলেন। সোমেশ্বর বলে, একটা কথা বলতে পারি ব্যারিস্টার-স্যার ?

বাসু বিরক্ত হয়ে বলেন, পার। কিন্তু অতি সংক্ষেপে।

—এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, স্যার ?

—অফকোর্স। লাঞ্চার আগে তিন-পেগ হুইস্কি তো বাড়াবাড়ি বটেই। কী গিলছ ওটা ? রয়্যাল স্ট্যাগ ?

সোমেশ্বর হাতের গ্লাসটা দেখিয়ে বলে, আমি স্যার এটার কথা বলছি না। বলছি ওই লোচ্চাটার কথা।

বাঁ হাতটা বাড়িয়ে সে নির্জন সমুদ্রবেলায় কপোত-কপোতীকে দেখিয়ে দিল। সমুদ্রসৈকত সম্পূর্ণ নির্জন। শুধু ওই একটা ছাতার তলায় দুজনে ক্রমাগত বকবকম্ করে চলেছে।

সোমেশ্বর যোগ করে, পালিতটা কি এর আগে জ্যাস্ত কোনও সুন্দরী মেয়েছেলে দেখেনি ?

বাসু জানতে চান, পালিত? কোন পালিত?

—ওই যে সমরেশ পালিত। শালা নাকি কিনু গোয়ালার গলিতে মাঝরাত্তে কনুই বাজায়।

—কী করে জানলে? কে বলেছে?

—কে বলেছে মনে নেই। ওই ইয়ে আরকি...পাঁচজন বলে।

—ও তাই বুঝি?

বাসু উঠে পড়েন। হুইল-চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে। এ মদ্যপের মাতলামি থেকে পালাবার একমাত্র পথ : স্থানত্যাগ করা।

একটু পরেই ওঁদের ডাকতে এল কৌশিক-সুজাতা। ডাইনিং হলে গিয়ে দেখেন কর্নেল, ব্রজদুলাল, সুদীপা আর পায়ের বসেছে একটা টেবিলে। বিপরীত টেবিলে গিয়ে বসলেন ওঁরা চারজন। লক্ষ্য হলো—ডাইনিং হলের দূরতম প্রান্তে একা বসে মধ্যাহ্ন আহার সারছিল অপূর্ণিতা। হঠাৎ সে উঠে ওয়াশ-বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল। মনে হলো আহা! অসমাপ্ত রেখেই।

সুজাতা মেনু-কার্ড দেখে লাঞ্চার অর্ডার দিল। রানী জানতে চান, ফুটকির খাওয়া হয়েছে? সুজাতা ঘাড় নেড়ে জানায়, ফুটকির মধ্যাহ্ন আহার সমাপ্ত। ফুটকি হচ্ছে বিশেষ দিদি। এখন সে মিঠুর দেখভাল করে। বিশেষ কলকাতায়। একা কুস্তনকলবুঁদির গড় রক্ষা করছে। কৌশিক বলে, মামু আজ সকালে একেবারে চুপচাপ ছিলেন। একটা কথাও বলেননি। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন সমুদ্রের দিকে। কী দেখছিলেন, মামু, অমন করে?

—নিম্নচাপ। বহু বহু দূরে সমুদ্রের মাঝখানে একটা নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। সাইক্লোন অনিবার্য। পৌঁছতে দিন দুই-তিন লাগবে মনে হচ্ছে।

—নিম্নচাপ? মানে ঝড়ের লক্ষণ? সাইক্লোন?

—তাই তো আশঙ্কা করছি। ঝড়টা কোন দিক থেকে আসছে, কোন ঘরটা ভাঙবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। একটা অসঙ্গতি মিটলেই সেটা বোঝা যাবে।

—অসঙ্গতি! কিসের অসঙ্গতি?—জানতে চান রানী।

—আজ সকালে অনেকে অনেক কথা বলেছে; কিন্তু তার মধ্যে একটা ভুল আছে। ভ্রান্তি। মিথ্যা কি না জানি না...কিন্তু একটা অনিবার্য অ্যাপারেণ্ট-কন্ট্রাডিকশন। যা হয় না তাই...কিন্তু কে বলল? কখন বলল?

—কী জাতের কন্ট্রাডিকশন?

—ধর, কেউ যদি বলে, ক্যালেন্ডারে দেখলাম : এ বছর গুড ফ্রাইডের ছুটিটা রোব্বারে পড়ে নষ্ট হয়েছে—এইরকম আপাত-অসঙ্গতি।

—আই সী। কিন্তু কে বলল? কখন বলল?

—দ্যাট্‌স্‌ দ্য মিলিয়ন-ডলার কোশ্চেন। কে বলল? এবং কখন বলল? মেমারির পাতা উল্টে দেখ—কী অসঙ্গতি। আগে থেকে সেটা চিহ্নিত করতে পারলে ঝড়ের সময় কাজে দেবে।

সুজাতা বললে, আমার কানে একটা অসঙ্গতি লেগেছে। সোমেশ্বরবাবু বললেন বিয়ের সময় ওঁর বউ ছিল ‘বেটার থ্রিফোর্থ’; কিন্তু ওঁর হাঁটু ভাঙার পর বউ হয়ে গেল ‘বেটার সেভেন-এইট্‌থ্‌’ তাই না? কিন্তু ওদের বিয়ে তো হয়েছে মাত্র তিন মাস। হাঁটুটা কি তার আগে ভাঙেনি?

বাসু বলেন, এটা একটা অসঙ্গতি বটে। কিন্তু ভগ্নাংশগুলো তো কথার কথা। আমি যে ভ্রান্তিটার কথা বলছি তা আরও বড় জাতের। ডেলিবারেট গ্রস বেইট টু এন্টাইন্স আদার্স। মাছের টোপ। কী সেটা?

এখানে সূর্যের আলোর তেজ এখন কমে যায় পৌঁনে ছয়টায়। ওঁরা সদলবলে বেরিয়ে পড়েন সাক্ষ্যভ্রমণে। আজ কিন্তু হোটেল-পোর্চেই ওঁদের সবার জন্য অপেক্ষা করছিল একটা বিস্ময়। বাসু-সাহেবের ভাষায় : যা হবার নয় তাই।

পোর্চে সোমেশ্বর আর সমরেশ মুখোমুখি বসে দাবা খেলছে। দর্শকের আসনে বসে আছে অর্পিতা। দুই দাবাড়ু চোখ তুলে চাইল না পর্যন্ত। সুদীপা সোমেশ্বরের দিকে ফিরে বলে, অনামিকা কি ঘরে?

সোমেশ্বরের কানে প্রশ্নটা ঢোকে না। তার আগেই সমরেশের ঘোড়া আড়াই পা এগিয়ে এসেছে। অর্পিতা নিঃশব্দে তার তর্জনী তুলে দেখাল। দূরে-বহুদূরে একটি ছাতার তলায়—এবার ছাতাটি পশ্চিম দিকে হেলেছে—অনামিকা একটি পত্রিকা পড়ছে একমনে। তার পরনে একটা চাঁপা রঙের কাজ্জিভরম, ম্যাচিং ব্লাউস ও হাইহিল।

ওঁরা পোর্চ ছেড়ে বালুবেলায় নেমে এলেন। কর্নেল আর বাসু-সাহেব পদচারণা শুরু করলেন পশ্চিমমুখো। মেয়েরা পূর্বদিকে। কৌশিক রইল রানীদেবীর কাছে। ব্রজদুলালও হাঁটতে নারাজ। কৌশিক বলল, বুঝলেন, মামিমা, প্রথমে মনে হয়েছিল জ্যামিতিক ফিগারটা চতুষ্কোণ। পরে বোঝা গেল অর্পিতা নন্থএন্টিটি—ওই যাকে বলে, এলেবেলে। সুতরাং জিওমেট্রিক ফিগারটা হয়ে গেল সমকোণী ত্রিভুজ। শীর্ষবিন্দুতে অনামিকা—আর অতিভূজের দুই প্রান্তে দুই যুযুধান যণ্ড—সেই ইটার্নাল ট্রায়েঙ্গেল। এবেলা দেখছি, তাও ঠিক নয়। প্রবলেমটা অধিবৃত্তের। ইলিপ্স-এর দুটি ফোসাই—দুই নাভি এখন কাছাকাছি এসে গেছে। মিলে গেলেই অধিবৃত্তটা বৃত্তে

পরিণত হবে। বর্তমানে ওই অধিবৃত্তপথে ‘নামিতা নিম্ননাভি’ অতিদূর দিয়ে নাভিদ্বয়কে পরিক্রমা করছেন।

ব্রজদুলাল বিরক্ত হয়ে বলেন, সাদা বাঙলায় কথা বলতে কি ভুলে গেছ কৌশিক?

কৌশিক বললে, সাদা বাঙলায় : ওদের দুজনের লড়াই-কাজিয়া মিটে গেছে। আর ভয়ের কিছু নেই।

—তুমি তো তাই বলছ, কিন্তু বাসু-সাহেব তখন কি যেন নিম্নচাপের কথা বলছিলেন। একটা নাকি সাইক্লোন হতে পারে।

কৌশিক প্রত্যুত্তর করার সময় পেল না। লক্ষ্য হলো, ওরা তিনজনে পোর্চ থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে। দাবা খেলায় সোমেশ্বর হেরে গেছে। সমরেশ বললে, একটা কথা বলতে এলাম। আমরা কাল খুব সকালে চিঙ্কা যাব ভাবছি। আপনারা কে-কে পার্টিসিপেট করবেন?

রানী বললেন, ওঁরা সবাই ফিরে আসুন তখন কথা হবে।

সাক্ষ্য ভ্রমণান্তে সবাই যখন একত্র হলেন—অনামিকা বাদে, সে ঘরে চলে গেল—তখন প্রস্তাবটা আবার পেশ করল সমরেশ। চিঙ্কা ওখান থেকে তিন-চার ঘণ্টার মোটরপথ। ওদের পরিকল্পনা প্যাকেট-ব্রেকফাস্ট নিয়ে খুব ভোরে রওনা দেওয়া। লেটেস্ট ছয়টা। তাহলে চিঙ্কায় গিয়ে রক্তায় লাঞ্চার সারা যাবে। আবার চারটে নাগাদ রওনা দিলে রাত আটটায় ফিরে এসে এখানে ডিনার করা যাবে। যাত্রীসংখ্যা বুঝে ওরা স্থির করবে কী গাড়ি নেওয়া হবে।

দেখা গেল, বিশেষ কেউই উৎসাহিত হলেন না। অধিকাংশেরই চিঙ্কা দেখা। সুদীপা আর পায়ের সুজাতাকে জনাস্তিকে বললে, ওই দেমাকির সঙ্গে কে যাবে? আজ সারাদিনে এসে আলাপ করবার সময় হলো না তার।

অগত্যা ওরা একটা টাটা-সুমো বুক করল। চারজন আরামসে যাবে। অনামিকা, সোমেশ্বর আর পালিত দম্পতি।

পরদিন নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে সূর্যোদয়ের অনেক আগেই বের হয়েছিলেন বাসু-সাহেব। সমুদ্রসৈকতে অনেকটা হেঁটে যখন ফিরে এলেন, ততক্ষণে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। তবে মেঘের আড়ালে। হঠাৎ নজর হলো, নির্জন পোর্চে একা বসে আছে অর্পিতা। রুমাল দিয়ে চশমার কাচটা মুছে। বাসু-সাহেবকে দেখে তড়িঘড়ি চশমাটা নাকে চড়াল। ওর চোখ দুটো লাল। বাসু অবাক হয়ে বলেন, এ কি। তোমরা যাওনি?

ধরা গলায় অর্পিতা বলল, আমি যাইনি। ওরা গেছে।

—তুমি গেলে না কেন?

—ভোর রাত থেকে লুজ-মোশান হচ্ছে। পেটটা আপসেট করেছে।

—স্যাড কেস। তা ওরা তিনজন একদিন জার্নিটা পোস্টপোস্ত করলেই পারত।
কাল যেত। চিন্তা তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

নতনেত্রে অর্পিতা বলল, ওরা তিনজন নয়, দুজন।

—মানে?

—মিস্টার ব্যানার্জি, আই মীন মিস্টার ঘোষালও যাননি। কাল রাত্রে অত্যধিক ড্রিংক করেছিলেন। এখনো খোঁয়াড় ভাঙেনি।

—আই সী।

বাসু বসলেন সামনের একখানা চেয়ার দখল করে। বেড-টির আগে সচরাচর উনি ধূমপান করেন না। আজ কিন্তু প্রয়োজন হলো। পকেট থেকে পাইপ আর পাউচ বার করতে থাকেন।

—আমি...আমি কী করব বলুন মেসোমশাই? আপনি কী অ্যাডভাইজ দেন?
এখন আমার কী করা উচিত?

—বলছি। তার আগে আমাকে কিছু 'ডাটা' দাও দেখি। সমরেশ লোকটা কি বরাবরই এই জাতের? কতদিন বিয়ে হয়েছে তোমাদের? পরস্পরীকাতরতা কি ওর স্বভাবজাত?

—পরস্পরীকাতরতা?

—না, আমি 'পরস্পরীকাতরতা'র কথা বলেছি। অপরের সুন্দরী স্ত্রী দেখলেই কি ওর মাথা ঘুরে যায়?

—তা কিছুটা যায়। দু'বছর বিবাহিত জীবনে এটা অনেকবারই লক্ষ্য করেছে। তবে এমন মাত্রাতিরিক্তভাবে নয়। সেটা এই প্রথম। এবারই।

—আই সী। দ্বিতীয়ত গান-বাজনার শখটা কার? তোমার না সমরেশের?

—কী আশ্চর্য। আপনি কেমন করে জানলেন?

—অর্পিতা, তুমি আমার পরামর্শ চেয়েছ। গ্র্যাটিস। পরামর্শ আমি দেব। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি কর না। যা জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও।

—গান-বাজনার শখ দুজনেরই। সেই সূত্রেই আমাদের প্রথম আলাপ। ও সেতার বাজায়। আর আমি আধুনিক সঙ্গীত গাই। অবশ্য একটা স্কুলে গানও শেখাই। আর ও চাকরি করে এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

—ও এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনিয়ার?

—না, না। ও ওখানকার এল. ডি. ক্লার্ক।

—বুঝলাম। তোমরা থাক কোথায়?

—খেলাৎবাবু লেনে। কেন?

‘কেন’ প্রশ্নটাকে আমল না দিয়ে বাসু বলেন, তোমাদের বাড়ির সামনেই বাঁ দিকে একটা আঁতাকুড় আছে, নয়?

অর্পিতা অবাক হয়ে বলে, আছে। আপনি কেমন করে জানলেন? তবে বাঁ দিকে নয়, বাড়ি থেকে বেরিয়েই ডান দিকে...

—না, আমি বাড়িতে ঢুকবার মুখে বাঁ হাতি একটা আঁতাকুড় আছে কি না জানতে চাইছিলাম।

—হ্যাঁ, ঢোকার মুখে ওটা বাঁ-দিকেই পড়ে।

—জ্যৈষ্ঠ মাসে, মানে এখন, তাতে কাঁঠালের ভূতি পড়ে? মাঝে মাঝে মরা-বিড়ালের ছানা?

অর্পিতা জবাব দেয় না। তার মুখটা হাঁ হয়ে যায়।

বাসু-সাহেব বললেন ; প্রশ্নের ধরনটা তোমার বোধগম্য হচ্ছে না, তাই না? সুদীপাকে জিজ্ঞেস কর, সে বুঝিয়ে দেবে। ও একটা স্কুলে বাঙলা পড়ায়। যাক সে কথা, তুমি পরামর্শ চাইছিলে ; তাই না? আমার পরামর্শ : ওরা দুজন চিল্কা থেকে ফিরে আসার আগেই তুমি সূটকেস গুছিয়ে নিয়ে তোমার খেলাৎবাবু লেনের বাসায় ফিরে যাও। চাবিটা আমাকে দিয়ে যেও। চেক-আউট করার দরকার নেই।

অর্পিতা স্তম্ভিত হয়ে যায়। বলে, ওকে ওই ডাইনীটার কজায় ছেড়ে দিয়ে?

—একজ্যাক্টলি। ও স্বভাব-ব্যভিচারিণী। তিন-বার বিয়ে করেছে। পুরুষমানুষ আর গল্‌দা চিংড়ির মুণ্ডু ও সমান তৃপ্তির সঙ্গে চিবিয়ে খেতে ভালবাসে। তা হোক, সে বিবাহিতা। তোমার কর্তাকে সে বিয়ে করতে পারবে না। কর্তাও তোমাকে ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার পক্ষে এখন সেরা চাল ‘কুইন পন’-কে দু’ঘর সামনে এগিয়ে দেওয়া। লিভ দ্য হোটেল অ্যাট ওয়াশ। লেট দ্য কিং ফলো দ্য কুইন।

—কিস্তু...

ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসু বলেন : নো মোর ‘কিস্তু’ প্রিজ। আমার ‘রায়’ দেওয়া হয়ে গেছে। অ্যাপিল করতে চাও তাহলে হায়ার কোর্টে যেতে হবে তোমাকে—ঈশ্বরের দরবারে। তর্জনীটা আকাশপানে তুলে দিলেন।

চট করে উঠে দাঁড়ান। ভিতর থেকে তখন ব্রজদুলাল, কর্নেল আর সুদীপা পায়ের বার হয়ে আসছে। অর্পিতা চটজলদি চোখটা মুছে নেয়।

সকলেই অবাক হলো। অর্পিতার দুঃখের কথা শুনে।

পায়েল সুদীপার কানে কানে জনান্তিকে বলে, শুনেছিস্? ঘোষাল-মাতালটা যায়নি। আকণ্ঠ মদ গিলে ফ্ল্যাট হয়ে নিজের ঘরে পড়ে আছে। তার সুন্দরী বউটাকে নিয়ে কে কী করছে মাতালটার স্নেহপই নেই। ছি-ছি-ছি...

সুদীপা হুস্ব-ইকারের বদলে তিনটি য-ফলার মাধ্যমে তার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ করল : ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা। লোকটা বনমানুষ। সারা গায়ে কী লোম দেখেছিলি? ওয়াক্।

ব্রজদুলাল অর্পিতাকে বললেন, ওষুধ-টষুধ কিছু খেয়েছ? খাওনি? বস এখানে। আমার কাছে ডায়াজিন ট্যাবলেট আছে, নিয়ে আসছি।

তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এলেন, বললেন, এখনই একটা ট্যাবলেট জল দিয়ে খেয়ে ফেল। আর এই অ্যাটিভান ট্যাবলেটটাও। ব্রেকফাস্টে কিছু খেও না, একটু লেবুর জল খেতে পার। যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। টেনে ঘুম দাও একটা।

অর্পিতা টেবিল থেকে ঘরের চাবিটা উঠিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল।

ব্রেকফাস্টের পর আজ অধিকাংশই ছাতার তলায় বসেননি। পোর্চে বসেছে ব্রিজের আসর। মুশকিল হলো ‘ফোর্থ-হ্যান্ড’ নিয়ে। কর্নেল, পায়েল আর কৌশিক। আর কারও উৎসাহ নেই। অনেকে জানেনই না খেলাটা। অনামিকাদের ঘরে একবার ওরা টু মেরেছিল। সুবিধা হয়নি। ‘বিরক্ত করবেন না’ বোর্ড টাঙিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে পাঁড় মাতালটা। অবশেষে রানী দেবীই বসলেন কৌশিকের পার্টনার হয়ে। বহুদিন পর তাস হুঁলেন তিনি। প্রথম মিঠু হারিয়ে যাওয়ার পর এই প্রথম।

প্রাক-লাঞ্চ পর্যায়ে যথারীতি এক রাউন্ড ‘অ্যাপিটাইজার’ এল—বীয়র, জিন অথবা ভদকা। মেয়েদের সফট্ ড্রিংক। আজ এটা ব্রজদুলালের সৌজন্যে। দু-বোতল বীয়র আর গ্লাস একটি ট্রেতে সাজিয়ে—আর ওই সঙ্গে এক প্লেট চিকেন-টিকিয়া নিয়ে হোটেল-বয়ের সাহায্যে ব্রজদুলাল এগিয়ে এলেন একটা ছাতার তলায়। যেখানে একমনে একটি ইংরেজি বই পড়ছিলেন বাসু-সাহেব। ব্রজদুলাল বললেন, আসুন স্যার, একটু বীয়র ‘ইচ্ছে করুন’। বলুন, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটার কী অবস্থা?

বাসু বইটা মুড়ে রেখে সাবধানে বোতল থেকে মাছরাঙা-বীয়র ঢালতে ঢালতে বললেন, সাইক্লোনটা এসে পড়ল বলে।

—সেটাকে ঠেকানো যায় না?

—কোনটাকে? বাড়টাকে? তাই কি সম্ভব? প্রাকৃতিক বিধান। সাবধানতা যেটুকু নেওয়া যায়, নিয়েছি। অর্পিতাকে যথাকর্তব্য পরামর্শও দিয়েছি। এখন দেখা যাক,

সে 'আমার কথা শোনে কি না—

—কী পরামর্শ দিয়েছেন তাকে?

—অবিলম্বে 'দ্য নুক' ত্যাগ করে নিঃশব্দে কলকাতায় ফিরে যেতে।

—আপনি তাকে তাই বলেছেন? দ্যাট সল্‌ভ্‌স্‌ দা প্রবলেম?

—কী প্রবলেম?

—শুনুন তবে :

ঘণ্টাখানেক আগে, মানে সাড়ে দশটা নাগাদ, ব্রজদুলাল ইউরিনালে যাবেন বলে নিজের ঘরে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই চাবি দিয়ে নিজের ঘরের দরজাটা খুলতে পারলেন না। অগত্যা রিসেপশান কাউন্টারের শরণাপন্ন হতে হলো। তখন জানতে পারলেন, তাঁর হাতের চাবিটা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্‌ পালিতদের ঘরের। অর্থাৎ অর্পিতা পোর্চে যখন ট্যাবলেটের সঙ্গে ঘরের চাবিটা তুলে নিয়েছিল—ঘণ্টা-চারেক আগে, তখন ভুল করে ব্রজদুলালের চাবিটা নিয়ে যায়। যাহোক ম্যানেজমেন্ট ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ওঁর ঘরটা খুলে দেয়। ব্রজদুলাল অর্পিতাকে ডিসটার্ব করতে চাননি। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট শোনেনি। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে পালিতদের ঘরটা খোলা হয়, ব্রজবাবুর ঘরের দ্বিতীয় চাবির সন্ধানে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড। সেঘরে অর্পিতা নেই। দীর্ঘ জবানবন্দির উপসংহারে উনি বললেন, আমার মনে হয়, সে আপনার পরামর্শটা শুনেছে। নিঃশব্দেই নিজের সুটকেসটা তুলে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছে।

বাসু বীয়ারে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে পাইপটা ধরালেন। ঘট-ঘট করে মাথা নাড়তে শুরু করলেন।

ব্রজদুলাল বলেন, কী না? ঘাড়-নাড়া বুড়ো বনে গেলেন কেন?

—ওড ফ্রাইডের ছুটিটা রোব্বারে পড়ে নষ্ট হতে পারে না। দ্যাটস্‌ অ্যাবসার্ড।

—তার মানে?

—সংক্ষেপে বলিতে গেলে : হিংটিংছট।

—আপনার মশাই সব সময়েই হেঁয়ালি।

লাঞ্চ-টেবিলে আর এক বিস্ময়। পায়েল-সুদীপাদের টেবিলে অর্পিতাও আহারে মছে। ব্রজদুলাল ওটি ওটি তার কাছে এগিয়ে এসে বলেন, এখন শরীর ঠিক হয়ে ছে?

অর্পিতা ঘাড় নেড়ে জানায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

—আমার ঘরের চাবিটা তোমার ব্যাগে।

—আজ্ঞে না। ভুলটা বুঝতে পেরেই আমি সেটা কাউন্টারে জমা দিয়ে দিয়েছি। আমার নিজের ঘরটা ওরা প্রথমে খুলে দিয়েছিল ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে। পরে আপনি জমা দেওয়ায় আমার ঘরের চাবিটাও পেয়ে গেছি।

—আর পেট কামড়াচ্ছে না তো? ঘুমটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে না, পেট কামড়ানি একেবারে সেরে গেছে। ঘণ্টাচারেক টানা ঘুমিয়ে শরীরটাও ঝরঝরে লাগছে।

—ভেরি গুড। লাঞ্চেও বুঝে শুনে খেও বাপু। দই খেতে পার। টক দই। ভাজাভুজি বেশি নিও না।

ওঁরা পাঁচজনে এক টেবিলে বসলেন। তখনি নজরে পড়ল ঘরের শেষপ্রান্তে একা-একা বসে আছে সোমেশ্বর। চোখাচোখি হতেই হাত তুলে বলল, গুড-ডে।

সুজাতা চাপা গলায় বলে, কিসের গুড-ডে? সকালে খোঁয়াড় ভেঙে উঠেই তো দেখলি বাপু, খাঁচা খালি। পাখি ফুরুং। এটা তোর গুড-ডে?

রানী বলেন, আহ। চূপ কর। শুনতে পাবে।

সুজাতা নিচু গলায় আরও বলে, কী করে চূপ করি মাসিমা? দেখুন কী তৃপ্তি করে মুরগির ঠ্যাঙ চিবাচ্ছে। ঠিক যে ভঙ্গিতে রঙাতে ওর বউ সমরেশবাবুর মুণ্ডটা চিবাচ্ছে।

এবার ধমক দেয় কৌশিক : তোমার হলো কী সুজাতা? খেতে এসেছ, খেয়ে যাও। কে-কার মুণ্ড চিবাচ্ছে তা তোমাকে দেখতে হবে না।

ব্রজবাবু পাদপূরণ করেন, যতক্ষণ না সেই বিকিনি-মাস্ট্র বিকিকিনির হাতে তোমার কর্তাটিকে কিনে তার মুণ্ডটা চিবাতে শুরু করেন।

এ পাড়ায় একটা চাপা হাসির রোল ওঠে।

আহারাদির পর যে যার ঘরে দ্বিপ্রাহরিক ‘বেড়াল ঘুম’ দিতে এগিয়ে চললেন। রানী দেবীর হুইল-চেয়ারটা ঠেলতে ঠেলতে নিজের ঘরের সামনে এসে বাসু দেখেন সোমেশ্বর করিডরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছে।

—কী ব্যাপার? তুমি এখানে? আমার প্রতীক্ষায় নাকি?

—ইয়েস স্যার। যদি অনুমতি দেন পাঁচ মিনিট ডিসটার্ব করব।

—হ্যাঁ, কিন্তু ঘড়ি ধরে ঠিক পাঁচ-মিনিট। না হলে আমার ভাতঘুম ছুটে যাবে।

—আপনি মিলিয়ে নেবেন স্যার, চার-মিনিট উনষাট সেকেন্ড এক্সিড করবে না।

ঘরে এসে রানী নিজের খাটে উঠে বসলেন। শুলেন না। বাসু পাইপ ধরিয়ে

নিজের বিছানায় গিয়ে বসলেন। সোমেশ্বর চেইন-স্মোকারের কায়দায় স্টাম্প থেকে একটা নতুন সিগ্রেট ধরাল। চেয়াবে বসল। হিপ-পকেট থেকে মানিবাগটা বার করে বললে, আমি আপনাকে প্রফেশনালি কনসাল্ট করতে চাই। কী অ্যাডভান্স দেব স্যার?

—সংক্ষেপে কেসটা আগে শুনি। গ্রহণযোগ্য মনে করলে ‘রিটেইনার’ নেব বৈকি। তবে প্রথমই বলে রাখি বাপু, ডিভোর্সের মামলা আমি নিই না।

সোমেশ্বর আকাশ থেকে পড়ল। বলে, যা ক্বাবা! ডিভোর্স। কী বলছেন স্যার? কাঁটা সিরিজের আঠারোখানা কেছা আমার মুখস্থ। আপনি আপনার একনিষ্ঠ পাঠককে চেনেন না, কিন্তু আপনাকে কি আমার চিনতে বাকি? এই দেখুন স্যার, আপনি অহেতুক বাইশ সেকেন্ড নষ্ট করে দিলেন। শুনুন :

—আমার আশঙ্কা : আমি বেমজ্বা খুন হয়ে যেতে পারি। আমার স্ত্রীর স্বভাবই হচ্ছে নিতানতুন শাড়ি-ব্লাউজ, নিতানতুন পুরুষমানুষ। কী করব? এটা ওর রক্তে। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখুন। লেখাপড়া অল্প শিখেছি। চাকরি জুটেছিল ফুটবলার হিসাবে। ঠ্যাঙ ভেঙে আমি অথৈ জলে। একবার বাইসিক্ল কিকে গোল্ডেন গোল করে ফাইনাল জিতেছিলাম। কাগজে ছবি পর্যন্ত বের হয়েছিল। অবশ্য আমার নয় বাইচুঙের। বাইসিক্ল কিকে কেউ গোল করলেই সব খবরের কাগজে বাইচুঙের সেই অনবদ্য ছবিখানি ছাপা হয়। তলায় ক্যাপশানে অবশ্য নতুন গোলদাতার নামটা ছাপা হয়। ফটোতে অ্যাকশন আছে, বাইচুঙের মুখখানা দেখা যায় না। তাতেই এই সুবিধে। ঘটনাচক্রে বিদ্যেধরী মাঠে ছিলেন। তখন তিনি শেষ স্বামীর বন্ধন থেকে সদ্যমুক্ত। প্রেমে পড়লেন আমার। অর্থাৎ তিনিও বাইসিক্ল কিকে উল্টে গেলেন। যেচে আলাপ করলেন। রেজিস্ট্রি বিয়ে করলেন। ঠিক তার পরেই আমি হাঁটু ভাঙলাম। আর্থিক সঙ্কতির দিক থেকে এখন আমি ওঁর নিরুপায় পরগাছা। বডি গার্ড-কাম ড্রাইভার-কাম হ্যান্ডিম্যান-কাম বেড-পার্টনার। অবিশ্যি সপ্তাহে আমার সে সৌভাগ্য জোটে গড়ে দু’দিন। বাকি পাঁচ দিন তিনি বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এতে ওঁর স্বভাবব্যাভিচারী চরিত্রটা তৃপ্ত হয়, বেশ কিছু অর্থাগমও হয়। আমার আপত্তি তো নেই, আগ্রহ আছে।...মাসিমা কিছু মনে করছেন না তো?

রানী বলেন, না, না, এসব কেসে আমি অভ্যস্ত। বলে যাও তুমি।

—হঠাৎ এ হারামজাদা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চায়। আমার স্ত্রীকে বলেছে, বেশ কিছু ‘অ্যালিমনি’ দিয়ে ওই সোমেশ্বরটাকে বিদায় কর। আমিও আমার স্কুল-মিস্ট্রেস স্ত্রীকে ডিভোর্স দেব। আর তারপর রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার মতো আমরা দুজন সুখে থাকব ‘এভার অফটারওয়ার্ডস্’। আমি, স্যার, রাজি হইনি, হবোও

না। যে হাঁস নিত্য সোনার ডিম পাড়ে, তাকে কি কেউ ‘অ্যালিমনি’ নিয়ে বেচে দেয়। ফলে ওরা ডেসপারেট। আমার লাইফের উপর অ্যাটেম্ন্ট হতে পারে। তিনকূলে আমার কেউ নেই। কিন্তু আমি চাই অপঘাতে আমার মৃত্যু হলে আপনি তদন্ত করে দেখবেন।

—হ্যাভ যু ফিনিশড?

—ইয়েস স্যার। এবার আপনার মতামত শুনতে চাই।

—তুমি যা বললে আমি শুনে গেলাম। কেস নিই আর না নিই এটা আপাতত কনফিডেনশিয়াল। এখন আমার ঘুমের সময়। ভেবেচিন্তে তোমাকে পরে জানাব।

—থ্যাঙ্ক, স্যার।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই নিচু হয়ে পদধূলি নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল সোমেশ্বর ইয়েল লকওয়ালা দরজাটা টেনে দিয়ে।

রাত আটটা। কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর রাত্রি। কিন্তু নির্মেষ আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। হোটেলের সম্মুখস্থ মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পের দৌরাঙ্ঘ্যে। ওঁরা সবাই বসেছিলেন হোটেলের সামনে পোর্চ-এ। কেউ কেউ সামনের বালুবেলায় ছাতার নিচে। হঠাৎ দুম করে লোড-শেডিং হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠলেন বাসু-সাহেব। তুলে নিলেন এক হাতে ছোট টর্চটা, অন্য হাতে কর্নেলের বাইনো। পড়ি-তো-মরি ছুটলেন নির্জন সৈকতে।

—কী হলো?—বলে পিছন-পিছন ছুটে এল কৌশিক।

—লুক অ্যাট দ্যাট সিলেন্সিয়াল কাপ, ওভারটার্নড অন দ্য ফেস অব দ্য সী।

আমাদের দৃষ্টিতে ওরা হঠাৎ-ফুটে-ওঠা এক ঝাঁক অচেনা তারা। আর ওঁর কাছে সবাই হারানো বাস্কবী। নাগরিক আলোর রোশনাইয়ে ওরা ছিল বোরখাঢাকা। সূর্য এখন বৃষ রাশিতে। ওই তো পশ্চিম দিগ্বলয়ে সিংহ রাশির মঘা—রেণুলাস। উত্তরাকাশে ডেনেব, অভিজিৎ; দক্ষিণাকাশে বৃশ্চিক রাশি জ্বলজ্বল করছে—তার মধ্যমণিকা অ্যান্টারিস : জ্যেষ্ঠা। বুট্‌স্ নক্ষত্রমণ্ডলী, দু’হাত বাড়িয়ে প্রতীক্ষমানা : স্বাতী।

পর-পর দুটি ঘটনায় তন্ময়তা কেটে গেল বাসু-সাহেবের। প্রথম লোড-শেডিং শেষ হলো। বাতি জ্বলে উঠল। দ্বিতীয়ত, একটা টাটাসুমো গাড়ি এসে দাঁড়াল পোর্চের কাছে।

গাড়ি থেকে নেমে এল ওরা দুজন। মালপত্র কিছু নেই। দুজনেরই কাঁধে দুটি হাতব্যাগ। অনামিকার পরনে এখন নীলরঙের একটা জর্জেট বেনারসী, ম্যাচিং ব্লাউজ

আর নীল হাইহিল, নীল হাতবটুয়া। গেইনস্বরো ওকে দেখলে ব্লু-বয়ের পরিপূরক একটি 'ব্লু-গ্যেল'-এর ছবি আঁকতেন হয়তো ; আর পঞ্চতন্ত্রের লেখক দেখলে লিখতেন 'সা নীলীবর্ণা সঞ্জাত'।

হাতবটুয়া খুলে ড্রাইভারকে টাকা মিটিয়ে দিল অনামিকা। তারপর চোখ তুলেই দেখতে পেল সামনে দাঁড়িয়ে আছে সোমেশ্বর। আদুরে গলায় সে বলতে গেল, ওহ্। হাউ য়ু মিস্‌ড ইট ডার্লিং। চিল্‌কা ইজ...

কথাটা তার শেষ হলো না সোমেশ্বরের চোখে চোখ পড়ায়। সোমেশ্বরের দক্ষিণ-তর্জনীতে একটি চাবি দোদুল্যমান। ঠাণ্ডা গলায় সে বললে, ন্যাকামি যথেষ্ট হয়েছে। এবার ঘরে যাও। জামা-কাপড় ছাড়গে।

অনামিকা কী একটা কথা বলতে গেল প্রত্যন্তরে। তারপর লগুড়াহত কুকুরীর মতো মাথা নিচু করে স্থানত্যাগ করল। সোমেশ্বর এগিয়ে এল এক-পা। সমরেশের কাঁধের উপর রাখল একটা বাঘের থাবা। তারপর মিহি গলায় বললে, তারপর মিস্টার শুয়োরের বাচ্চা। আপনি কী স্থির করলেন? নিজে থেকেই নামবেন, নাকি আমাকেই সেটা করতে হবে?

সমরেশ নিশ্চয় গিল্ট-কনশাস। আমতা-আমতা করে বলে, এসব আপনি কী বলছেন, মিস্টার ঘোষাল? কোথা থেকে নামব?

—আমার বিবাহিতা স্ত্রীর স্কন্ধ থেকে। নিজেই নামবেন, না আমি ঘাড় ধরে নামাবো?

—আমি...আমি...আমার কী দোষ? আপনি মদের খোঁয়াড়ে উঠতে পারলেন না, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন...

—তাহলে আপনি গোটা ট্রিপটা ক্যানসেল করলেন না কেন? আমরা কাল যেতাম, অথবা পরশু?

—বাঃ। অনেক টাকা যে অগ্রিম দেওয়া ছিল—

—সেটা তো দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী, আপনি নয়।

—কারেক্ট। তাহলে প্রশ্নটা আপনার স্ত্রীকেই করবেন। আমাকে কেন?

—আপনাকে শুধু সাবধান করে দিতে চাই ; পরস্ত্রীর সঙ্গে কিছু ফুর্তিফার্তা করতে চান করুন—যদি আপনার স্ত্রীর আপত্তি না থাকে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বিবাহবিচ্ছেদবিশারদা স্ত্রী এবার তাঁর সাতপাকে বাঁধা বাঁধনটা ছিঁড়তে পারবেন না। আপনি যদি কোনও প্রফেশনাল কিলারকে এন্‌গেজ করেন তাহলে তাকে কাইন্ডলি জানিয়ে দেবেন যে, তার টার্গেটের হিপ-পকেটে সব সময় একটা লোডেড যন্ত্র থাকে। সেটা হিসাব করে যেন সে 'ফি'-টা স্থির করে।

হিপ-পকেট থেকে একটা ছোট কোস্ট পিন্ডল বার করে সে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ফের লুফে নিল।

সমুদ্রগর্জনে সব কথা হয়তো শোনা যাচ্ছিল না, কিন্তু অধিকাংশই শ্রুতিগোচর হচ্ছিল একসার দর্শকবৃন্দের শ্রুতিতে।

এবার সেদিকে ফিরে সমরেশ বললে, আপনারা দেখুন, উনি রিভলভার দেখিয়ে আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন কর্নেল সমাদ্দার। এক-পা এগিয়ে এসে বলে ওঠেন, ইয়েস। যু কাস্ট ডু দ্যাট। দ্যাটস্ আ ফ্রিমিন্যাল অফেন্স।

সোমেশ্বর বললে, থানা তো কাছেই। একটা এফ. আই. আর দাখিল করে আসুন না স্যার। স্বয়ং ব্যারিস্টার সাহেবই তো সাক্ষী আছেন।

পিন্ডলটা হিপ-পকেটে ভরে সে ফিরে চলল নিজের ঘরে।

রাত্রে ডিনার টেবিলে সবার খেয়াল হলো চারজন বোর্ডার অনুপস্থিত। দু'জোড়া কর্তা-গিল্লি। তারা বোধকরি একটু আড়ালে থাকতে চায়। অন্তত একটা রাত। তাই দূরভাষণে অর্ডার দিয়ে নৈশাহার নিজেদের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে। •

পরদিন অতি প্রত্যুষ। হোটেলের প্রধান ফটক তখনো তালাবদ্ধ। বাসুকে দেখে সিকিউরিটির লোকটা ঘুম-জড়ানো চোখে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। প্রশ্ন করে, সান্‌রাইজ দেখবেন, স্যার? লেकिन অখনো বিশ-বাইশ মিনিট দের আছে।

বাসু বললেন, তা হোক। গেটটা খুলে দাও তুমি। সকালের 'ওজোন' নেব একটু লাংসে।

লোকটা কিছুই বুঝল না। অবাক হয়ে তাকাল। বাসু-সাহেব একহারা মানুষ। তিনি কেন 'ওজন' নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন? যা হোক সে খুলে দিল দরজা।

বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা লাগল মুখে। সেটা উপভোগ করলেন। মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পটা নেভানো তাই আবার এক আকাশ তারা। তবে যারা ছিল সন্ধ্যার সাক্ষী তারা অন্তর্মিত। উঠে এসেছে নতুন তারার একঝাঁক প্রজাপতি। সামনের পিচ-ঢালা রাস্তায় নেমে পড়লেন। শেষরাতের হিমেল আর্দ্র বাতাসটা উপভোগ করতে করতে হনহনিয়ে এগিয়ে চললেন। সূর্যোদয় আজও দেখা যাবে না। পূব-আকাশে মেঘ আছে। হঠাৎ আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে বাসু-সাহেবের নজর হলো হোটেল থেকে চাদর মুড়ি দেওয়া কে একজন এগিয়ে আসছে।

খর্বকায় ব্যক্তি ; বোধহয় আলখাল্লা জাতীয় কিছু পরা। আরও একটু কাছে আসতে বাসু বুঝতে পারেন : ওটা আলখাল্লা নয়, গাঢ় রঙের নাইটি। আর সেই সঙ্গে চিনেও ফেললেন ওকে : অর্পিতা পালিত।

একটি ছাতার তলায় শিশির-ভেজা চেয়ারেই বসে পড়লেন উনি। অর্পিতা এগিয়ে এসে নীরবে বসল তাঁরে পাশের চেয়ারে। দুজনেই প্রথমে নীরব। শেষে বাসু বলেন, কিছু বলবে আমাকে?

—সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম। আমি জানি, আপনি খুব ভোরে বেড়াতে আসেন।

—বল?

—এখন আমি কী করব স্যার?

—ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান? এ প্রশ্নের জবাব তো কালই দিয়েছি। তুমি শুনলে না। আজও ওই একই পরামর্শ দেব। আমার আশঙ্কা এবারেও তুমি শুনবে না।

—কিন্তু কী করে যাব? ও যে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

—বুঝলাম। আমার কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দাও তো অর্পিতা। কাল সকালে তুমি ভুল করে ব্রজবাবুর চাবিটা নিয়ে চলে গেলে। তারপর কী হলো? কী করলে তুমি?

—ডায়াজিন ট্যাবলেটটা খেলাম। ঘুমের ওষুধটাও খেলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম। পাঁচ চার ঘণ্টা টানা ঘুমিয়েছি।

—না। তা তুমি ঘুমাওনি। সাড়ে দশটা নাগাদ হোটেল ম্যানেজমেন্ট থেকে ওরা ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তোমার ঘরটা খুলেছিল। তখন তো তুমি ঘরে ছিলে না?

—সাড়ে দশটার সময়? ও হ্যাঁ, একবার বার হয়েছিলাম বটে। কলকাতায় একটা এস. টি. ডি. করতে।

—কাকে? তার নাম্বারটা কত?

—কী আশ্চর্য। আপনি বিশ্বাস করছেন না? নম্বর কি আমার মুখস্থ? সে তো আমার ডায়েরিতে লেখা আছে। ঘরে চলুন, দেখে বলছি।

—তার আগে বল, তুমি নিজের ঘরে ঢুকলে কী করে? তোমার হাতে তো ব্রজবাবুর ঘরের চাবি। তাহলে তুমি কেমন করে চাবি খুলে ঘরে ঢুকলে? ওষুধগুলো খেলে? সাড়ে দশটা নাগাদ ডায়েরিটা হাতে নিয়ে এস. টি. ডি. করতে বেরিয়ে গেলে?

—বাঃ। ওরা...মানে, রিসেপশান থেকেই তো ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে আমার ঘরটা আমাকে খুলে দিল।

—সেটা তো বেলা এগারোটা দশে। রিসেপশানের কাউন্টারে যে মেয়েটি বসে তার স্টেটমেন্ট অনুসারে।

হঠাৎ যেন একটা নতুন কথা মনে পড়ে গেল অপিতার। বললে, ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমি ঘরে আদৌ ঢুকিনি। ওষুধটাও তখন খাইনি। একটা রিকশা ধরে চলে গিয়েছিলাম এস. টি. ডি. বুথে।

—কিন্তু তোমার ডায়েরি তো ঘরে। আর নম্বর তো তোমার মুখস্থ নেই।

—কী আশ্চর্য। আপনি এভাবে জেরা করছেন কেন? আমি অহেতুক মিথ্যা বলতে যাব কেন বলুন? কাল ডায়েরিটা ছিল আমার ভ্যানিটি ব্যাগে। তাই কোনও অসুবিধা হয়নি।

—বুঝলাম। তা তুমি আমার কাছে ছুটে এসেছ কেন?

—ওই তো। একই কথা জিজ্ঞেস করতে। আমি এখন কী করব?

বাসু বললেন, ওই তো, একই জবাব দেব আমি। রিপোর্ট দ্য মিডিয়াচার। এক্সুগি হোটেল ছেড়ে খেলাৎবাবু লেনের বাসায় ফিরে যাও। তোমার কর্তা সঙ্গে গেল কি না ফিরেও তাকিয়ে দেখ না।

—কিন্তু...

—কালই বলেছি: কিন্তুর শেষ নেই। আমার রায় আমি দিয়েছি। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস কর অপিতা—এ-কথা কেন আমি বলেছি। তারপর আমার কথায় নয়—বিবেকের নির্দেশে পথ চল।

হনহন করে এগিয়ে গেলেন বাসু সাহেব।

ব্রেকফাস্ট সেরে আবার সবাই সমবেত হয়েছেন সমুদ্রসৈকতে। তবে আবার সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন দাবার ছকটা পেতে ওরা দুজন আপনমনে খেলছে। কী বিচিত্র মনুষ্যচরিত্র। কাল রাতে যারা লড়াই-কাজিয়ার চূড়ান্ত করেছে তারা আজ এ-ভাবে দাবা খেলে কী করে?

প্রশ্নটা বাঙ্কবীকে জিজ্ঞেস করল পায়েল, ওদের কি হায়া-কায়া, লজ্জা-শরম কিছুটি নেই?

সুদীপা প্রতিপ্রশ্ন করে, তুই বনফুলের 'দ্বৈরথ' পড়েছিস?

—না। একথা কেন?

—পড়া থাকলে বুঝতে পারতিস।

হঠাৎ কর্নেল সাহেব বলে ওঠেন, আজ ড্রিংসটা স্ট্যান্ড করব আমি। তবে আমি বুড়ো মানুষ। কৌশিক, তুমি জেনে নাও কে কী খাবে? এস্তাজাম কর।

সমরেশ বলে, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি, কৌশিকবাবু।

সোমেশ্বর বলে, বাঃ। খেলাটা—?

—ও। আপনার বুঝি নজরে পড়েনি? এই ঘোড়ার কিস্তিতেই তো আপনি মাং।
আবার চালটা ভুল দিয়েছিলেন আপনি।

সোমেশ্বর হতাশ। বলে, হেঙেরি। পরপর দু'বার মাত হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে কৌশিক সংগ্রহ করে জেনে নিয়েছে কে কী নেবে। সকলেই নিজ-নিজ পছন্দ মতো ড্রিংস নিয়েছেন। দিদিমণিদ্বয় আজ 'ভদকা' পরখ করতে রাজি হয়েছেন। তবে এক-এক পেগ মাত্র। বাসু, কর্নেল আর ব্রজবাবু নিয়েছেন মাছরাঙা। পার্থক্যের মধ্যে সোমেশ্বর আজ আর হুইস্কি নেইনি। নিয়েছে জিন-উইথ-ফ্রেশ লাইম।

আজ আরও একটা ব্যতিক্রম হলো। ঘিয়ে রঙের একটি বালুচরী পরে হঠাৎ ভিতর দিক থেকে বার হয়ে এল অনামিকা। অমিট্রায়ের ভাষায়—‘এ তো আগমন নয়, আবির্ভাব।’

যুক্তকর বুকের সামনে তুলে অনামিকা বললে, আপনাদের কারও সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। দোষটা আমারই। সেই ক্রটি সংশোধন করতে এলাম। সকলের সঙ্গে পরিচিত হতে। কী জানেন, আমি লোকটা স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। ইন্ট্রোভার্ট। লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশতে পারি না।

সুদীপা এ সুযোগ ছাড়ল না। বলে, তাই বুঝি? অর্পিতাপতির সঙ্গে আপনার দ্রুত গড়ে-ওঠা বন্ধুত্বে আমরা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি।

অনামিকা অবাক হয়ে বলে, ‘অর্পিতাপতি।’ তার মানে?

—‘অর্পিতার পতি। আমি ষষ্ঠী তৎপুরুষে বলেছি। অর্থাৎ সমরেশবাবু।

অনামিকা বুঝতে পারে এরা ওর ‘লেগ্ পুলিং’ করছে। সোমেশ্বরের কথামতো এ ধাপ্টামো না করলেই ভাল হতো। কিন্তু এখন আর পিছানো চলে না। সুদীপার দিকে ফিরে বলে, আয়াম সরি, অর্পিতাদি। অনেক আগেই আমার উচিত ছিল আপনার সঙ্গে আলাপ করা। সমরেশ আপনার কথা তো সব সময়ে বলে।

সুদীপা প্রতিশ্রুতি করে বলে, আমার নাম সুদীপা বাগচি।

অনামিকা বিহুল হয়ে ইতিউতি চাইতে থাকে। করুণা হয় রানী দেবীর। অর্পিতার পিঠে একটি হাত রেখে বলেন, এর নাম অর্পিতা। ভারি ভাল মেয়ে।

দুজনেই দুজনকে হাত তুলে শুধু নমস্কার করে। কারও কণ্ঠে কথা ফোটে না। ধপ করে বসে পড়ে অনামিকা। সোমেশ্বরের দিকে ফিরে বলে, আমাকেও একটা ড্রিংস্ দিতে বল : জিন-উইথ-ফ্রেশ লাইম।

মিনিট খানেক আগে সোমেশ্বরের হাতে সমরেশ খরিয়ে দিয়েছে একটা গ্লাস। সেটা থেকে পান শুরু করেনি সোমেশ্বর। খেলাচ্ছলে শুধু গ্লাসটা অন্যমনস্কভাবে নেড়েই চলেছে। যেন লেবুর সরবতে চিনি মেশাচ্ছে। আসলে সে ভদ্রতা করে গ্লাসটা হাতে ধরে অপেক্ষা করছিল। সবাই একসঙ্গে ‘চিয়াস’ বলে পান শুরু করবে বলে। এখন গ্লাসটা তার স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, তুমি এটা নিতে পার, আমি এঁটো করিনি।

পায়েল বললে, এঁটো করলেই বা ক্ষতি কী? কর্তার উচ্ছিষ্ট তো গিমিরা খেয়ে থাকেন।

সোমেশ্বর বললে, কী করে জানলেন? আপনি তো বিয়ে করেননি।

পায়েল কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। সুজাতা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। বলে, বাসি বিয়ের দিন কর্তার পাতাতেই তো নববধূকে খেতে হয়, এ তো সবাই জানে।

রানী দেবী সচরাচর এসব তর্কাতর্কিতে থাকেন না। আজ আগু বাড়িয়ে বললেন, মনুষ্যহিতার গৃহ্যসূত্রে বলা হয়েছে “ভুক্তবান্ধিষ্টবর্ধে দদাৎ।”

পানীয় গ্লাসটা তখনো সোমেশ্বরের হাতে ধরা। যেন এ বিতর্ক শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্লাসটা সে হস্তান্তর করবে না। বলে, তার মানে?

রানী ব্যাখ্যা দেন, গৃহ্যসূত্রাকার শিষ্যকে বলছেন, ‘বাপুহে। আহারাণ্ডে যা খেতে পারলে না সেই ভুক্তবান্ধিষ্ট-সমেত এঁটো পাতাখানা স্ত্রীকে ধরে দেবে।’

সুদীপা বাঙলায় এম. এ.। সে আর নিশ্চুপ বসে থাকতে পারল না। বলে ওঠে, ওসব হচ্ছে ‘উইমেন্‌স্‌ লিব’-এর আগের যুগের কথা, মাসিমা। এখন কর্তারাও হামেহাল গিমির এঁটো খেয়ে থাকেন।

সোমেশ্বর একই প্রশ্ন করে, আপনিই বা কী করে জানলেন? আপনারও তো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, মিস্‌ বাগ্‌চি।

সুদীপা চটুজলদি জবাব দেয়, ওটা আপত্তিকর হলে বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথে আমরা ‘মুখচূষন’ শব্দটা পেতাম না। সেই আনন্দঘন মুহূর্তে কে কার উচ্ছিষ্ট পান করে? বলুন? আমার না থাক আপনার তো সে অভিজ্ঞতা আছে।

রানী ছদ্মভর্ৎসনা করে ওঠেন, মেয়েটার মুখের কোনও আড় নেই।

সোমেশ্বর যেন পরাজয় মেনে নিয়ে এতক্ষণে গ্লাসটা অনামিকাকে হস্তান্তরিত করে। ইতিমধ্যে সমরেশ আর একটি জিন-উইথ-লাইম সোমেশ্বরের টেবিলে নামিয়ে রেখেছে। বস্তুত সকলের হাতেই পানপাত্র পৌঁছেছে। ‘চিয়াস’ বলে সবাই একসঙ্গে

পান শুরু করে। ব্যতিক্রম শুধু অনামিকা। তার গলাটা এতক্ষণে শুকিয়ে কাঠ। মদ্যপানে সে অভ্যস্তও। ঢক্-ঢক্ করে প্রায় গোটা গ্লাসটা শেষ করে ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখে।

রানী দেবী অনামিকাকে বলতে গেলেন, তোমাদের চিন্কা ভ্রমণটা...

কথাটা তাঁর শেষ হলো না। ওঁর মনে হলো, অনামিকা কেমন যেন করছে। তার ঠোট দুটো নীল হয়ে গেছে। বকের বাঁ-দিকটা খামচে ধরে সে যেন নেতিয়ে পড়ছে।

সূজাতা চিৎকার করে উঠল, কী? কী হয়েছে অনামিকা? তুমি ওরকম করছ কেন?

সবার দৃষ্টি ঘুরে গেল অনামিকার দিকে। অনামিকা ততক্ষণে প্রায় শুয়ে পড়েছে। ঠোট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে গেছে। মুখটা নীল। শিবনেত্রপ্রায়।

সোমেশ্বর তার উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কী কষ্ট হচ্ছে অনু?

—বুঝতে পারছি না...বুকে অসহ্য যন্ত্রণা...ওই ড্রিংকস্টোতেই...

—এই ‘জিনটার’ কথা বলছ?

বহু কষ্টে মাথা নাড়িয়ে অনামিকা জানাল : হ্যাঁ, তাই।

—কিন্তু ওটা তো...ওটা তো আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সমরেশ। ইয়েস। ইট ওয়াজ মাই গ্লাস। শুড গড!

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল সে। সমরেশের কলারটা চেপে ধরে বলে, যু, সান অফ আ বিচ্। বল্...বল্...আমার গ্লাসে কী মিশিয়েছিলি?

কৌশিক লাফিয়ে পড়ে বাধা দেয়। বলে, কী হচ্ছে এসব? সরে আসুন আপনি—অনামিকাকে নিশ্বাস নিতে দিন...

কিন্তু নিশ্বাসের জন্য বাতাসের আর প্রয়োজন ছিল না অনামিকার। তার ভবযন্ত্রণার অবসান হয়েছে।

কর্নেল চিৎকার করে উঠলেন : ডাক্তার। এক্সুগি একজন ডাক্তার।

বাসু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। অনামিকার কজ্জি, বাহুমূল এবং চিবুকের নিচে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সরি। শী হ্যাজ এক্সপায়ার্ড।

ঘণ্টা দুয়েক পরের কথা। হোটেলের হাউস ডক্টর এসে সরকারীভাবে অনামিকাকে মৃত ঘোষণা করে গেছেন। থানা থেকে দুজন অফিসার এসেছিলেন। তাঁরাও মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন। ফটো নিলেন। মৃতদেহকে মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

একে-একে সকলেরই জবানবন্দি নেওয়া হলো। হ্যাঁ, এটা ফ্যাক্ট যে, সমরেশ একটা ট্রে-তে পাঁচ-সাতটি পানীয় সাজিয়ে নিজহাতে ‘বার’ থেকে লাউঞ্জ পার হয়ে পোর্টিকোর জমায়েতে নিয়ে এসেছিল। সোমেশ্বর ট্রে থেকে যে-কোনও একটি গ্লাস তুলে নেয়নি, বরং সমরেশই ওই বিশেষ গ্লাসটি তার হাতে ধরিয়ে দেয়। ‘বার’ থেকে লাউঞ্জ পার হয়ে বাইরে আসতে যে দেড়-দু’মিনিট সময় লাগে, সে সময় সমরেশ একাই ছিল। কৌশিক তখন বার-কাউন্টারে। ফলে এইটুকু সময়ের মধ্যে সমরেশের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট গ্লাসে এক পুরিয়া বিষ মিশিয়ে দেওয়া অসম্ভব কোনও কাজ নয়। তবে, কেউ তাকে এ কাজ করতে দেখেনি। এটাও সবাই দেখেছে যে, সমরেশ যে গ্লাসটা সোমেশ্বরের হাতে দিয়েছিল, সেটাই সোমেশ্বর তার স্ত্রীকে দেয় এবং অনামিকা সে গ্লাস থেকে পানীয়টা অতি দ্রুত খেয়ে ফেলে।

থানা-অফিসার প্রতিটি ঘর সার্চ করেছেন। একটি বিচিত্র বস্তু তিনি আবিষ্কার করেছেন। সমরেশদের ঘর থেকে। সমরেশেরই সুটকেসের একটা সিক্রেট পকেট থেকে। এক ‘ফায়াল’ ঔষধ—ডিজিটালিস গ্রুপের ঔষধ। নাম : স্টেফেলথিন। ঔষধ বটে, তবে তীব্র বিষও। অ্যাকিউট হার্ট পেশেন্টদের চিকিৎসায় তার অত্যন্ত সীমিত ব্যবহার। সাধারণ মানুষের ব্যাগে সেটা থাকার কথা নয়। নির্মাণকারীর মুদ্রিত তথ্যে জানা যাচ্ছে : ওটা একশ গ্রামের প্যাক। তার আধাআধি ফাঁকা। জানা গেল, বিশ গ্রামই ‘ফেটাল ডোজ’—অর্থাৎ বিশ গ্রামই মৃত্যুবাহী বিষ। সমরেশের বক্তব্য : সে ওটার কথা কিছুই জানে না। সে ওটা কেনেনি, দেখেনি, তার সুটকেসে রাখেনি। তার তালাবন্ধ ঘরে অন্য কেউ ওই সিক্রেট ড্রয়ারে ওটা রেখে গেছে এটা পুলিশ বিশ্বাস করেনি। ফলে সমরেশকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।

প্রায় উন্মাদিনীর মতো কাঁদতে কাঁদতে অপরিতা ছুটে এসেছিল বাসু-সাহেবের ঘরে: আপনি ওকে বাঁচান, মেসোমশাই। ও একাজ করেনি। করতেই পারে না।—হাঁটু গেড়ে বসে জড়িয়ে ধরে ওঁর পা দুটো।

বাসু বলেন, উঠে বস, অপরিতা, পাগলামি কর না। আমি কথা দিচ্ছি সমরেশের জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

—আপনাকে কত ‘রিটেইনার’ দেব, মেসোমশাই?

—এখন নয়। আগে হাজতে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি। সে নিজমুখে আমাকে বলুক যে, সে এ কাজ করেনি।

অপরিতা ছিলে-খোলা ধনুকের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, তার মানে? আপনার মনে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে যে, সমর এ কাজ করেও থাকতে পারে?

—না নেই। আমার বিশ্বাস : ও নির্দোষ। কিন্তু এটাই আমার কাজের ধারা। তুমি

যাও, অর্পিতা। নিজের ঘরে বিশ্রাম নাও গে যাও। আমাকে একটু নিরিবিচি চিন্তা করতে দাও।

লাঞ্চে অধিকাংশই কোনওরকমে পিস্তিরক্ষা করে গেলেন। সকলের সব অনুরোধ উপেক্ষা করে অর্পিতা অনশনে রইল। ঘরে 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' বোর্ড টাঙিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি দিল।

সোমেশ্বরও লাঞ্চে গেল না। একটা জনি-ওয়াকারের বোতল আর তিন-চারটি সোডা 'বার'-কাউন্টার থেকে নিয়ে অর্গলবদ্ধ ঘরে নিজেকে স্বৈচ্ছাবন্দী করল।

কৌশিক বাসুকে বলল, চলুন মামু, যাহোক মুখে দেওয়া যাক।

বাসু বললেন, তোমরা তিনজনে কিছু খেয়ে এস। আমার জন্য এক প্লেট স্ন্যাক্স ঘরে পাঠিয়ে দাও।

—ভূমি কি দিনের বেলা ওই সিভ্যাস রিগ্যাল-এর বোতলটা বার করতে চাও নাকি?—রানীর সশঙ্ক জিজ্ঞাসা।

বাসু বিনীতভাবে বললেন, প্লিজ রানু। ইট্‌স্‌ আ ডে-অব্‌ একসেপ্‌শন।

বিকেল চারটে নাগাদ ওঁর ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দুজনের কারও ঘুম হয়নি। বাসু-সাহেব ফোনটা তুলে আত্মপরিচয় দিতেই ও প্রান্ত থেকে রিসেপ্‌শনিস্ট জানাল যে, গঞ্জাম থেকে এস. পি. মিস্টার এম. এম. পানীগ্রাহী এসেছেন, বাই রোড। নিহত ব্যক্তিটি পশ্চিমবঙ্গের একজন সেলিব্রেটি শুনে, এবং মৃত্যুটা রহস্যময়, একথা জানতে পেরে। হোটেলে এসে তিনি জানতে পেরেছেন বোর্ডারদের মধ্যে ক্যালকাটা-বারের অতি বিখ্যাত ক্রিমিনাল-সাইড ব্যারিস্টার পি. কে বাসুও আছেন। তাই তিনি বাসু-সাহেবকে সেলাম দিয়েছেন। তিনি যদি কাইন্ডলি...

সন্ধ্যা পাঁচটা। দীর্ঘ এক ঘণ্টা একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওঁরা তিনজন কীসব পরামর্শ করলেন। লোকাল থানা-অফিসার মিস্টার বিনায়ক পাণ্ডে, এস. পি. পানীগ্রাহী আর বাসু-সাহেব। ম্যারাথন-ডিস্‌কাশন এক সময় শেষ হলো।

ওঁরা তিনজনে বার হয়ে এলেন। এস. পি. দৃঢ়ভাবে বাসু-সাহেবের কর্মমর্দন করে বললেন, অশেষ ধন্যবাদ। ঘটনাচক্রে আপনি উপস্থিত না থাকলে হয়তো ভুল পথে কেসটা পরিচালিত হতো।

ওঁরা চলে গেলেন। ইন্টারোগেশনের জন্য অর্পিতা আর সোমেশ্বরকে থানায় নিয়ে গেলেন। আগেও ওঁদের দুজনের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ আলোচনার সময় এমন কিছু তথ্য জানা গেছে যে, এস. পি. মনে করতেন যে—
এক বৃক্ষে দুটি কাঁটা—৪

দুজনকে খানায় নিয়ে গিয়ে আরও নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

বাসু নিজের ঘরে গিয়ে দেখলেন সেটা তালাবন্ধ। সব ঘরই তাই। বুঝলেন, সব আবাসিকই সমবেত হয়েছেন বাইরের পোর্চে। অগত্যা সেদিকেই এগিয়ে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, যা আশা করেছিলেন : আজ আর ছাতার তলায় কেউ যায়নি। পোর্চেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। আজ আর ‘অ্যাপিটাইজার’-এর কথা কারও মনে পড়েনি। তাস-দাবার আসরও বসেনি। ছোট ছোট গ্রুপে নিচু গলায় সারাদিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলির রোমছুন হচ্ছে। ওই সঙ্গে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য, অর্পিতার দুর্ভাগ্য, সমরেশের নজিরবিহীন ব্যাভিচার আর অনামিকার...

না থাক, আহা, মেয়েটা তো প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্তই করে গেল।

বাসু-সাহেবকে দেখে ঝিমিয়ে পড়া জটলাটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বাসু দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন প্রতিদিনের আড্ডাধারীদের মধ্যে চারজন মাত্র অনুপস্থিত : সোমেশ্বর, অর্পিতা, সমরেশ আর অনামিকা।

ব্রজদুলাল বললেন, আপনার সেই ভবিষ্যদ্বাণীটা দারুণভাবে ফলে গেল : সাইক্লোন একটা আসছে। কার ঘর ভাঙবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

বাসু বললেন, সবটা প্রথমেই বোঝা যায় না। তাহলে তো দুর্ঘটনাটা এড়ানোই যেত।

কর্নেল বলেন, শুনলাম অর্পিতা আপনাকে সমরেশের তরফে লিগাল কাউন্সেলার হিসেবে রিটেইন করতে চেয়েছিল। আপনিই নাকি রাজি হননি।

বাসু গ্রীবা সঞ্চালনে স্বীকার করলেন।

কর্নেল সখেদে বললেন, কি করেই বা করবেন? সমরেশ যে অপরাধী এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সোমেশ্বর পাঁচ-দশ লাখ টাকা পেলেও অনামিকাকে ডিভোর্স দিত না। তাই তাকে দুনিয়া থেকে...

বাসু বাধা দিয়ে বললেন, সমরেশের জামিনের ব্যবস্থা হচ্ছে। কাল সকালেই সে ছাড়া পেয়ে যাবে—

কর্নেল পুনরায় বলেন, সাময়িকভাবে জামিনে ছাড়া পেলেও শেষ পর্যন্ত ওকে শাস্তি পেতেই হবে। কঠিন শাস্তি। ইট্‌স্ এ ক্রিয়ার কেস অব মার্ডার।

—মানছি। খুনই। কিন্তু খুনটা করল কে?

—অব্‌ভিয়াসলি সমরেশ। আবার কে?

বাসু বলেন, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলুন তো, কর্নেল সমাদ্দার। আপনাদের সকলের মতে—পুলিশের মতেও—সমরেশ বিষটা মিশিয়েছিল। ধরিয়ে দিয়েছিল সোমেশ্বরের হাতে। কারণ সোমেশ্বর মারা গেলে সে অর্পিতাকে ডিভোর্স করে ওই

অত্যন্ত ধনী, সুন্দরী, গ্ল্যামারাস মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারে। এই তো? তাহলে সে যখন স্বচক্ষে দেখল যে, সোমেশ্বর সেই বিষমিশ্রিত পানীয়টা অনামিকার হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে, তখন সে কাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল না কেন?—‘ওতে একটা মাছি পড়েছে’ এই অজুহাতে?

কেউ কোনও জবাব দিলেন না।

বাসু বলে চলেন, এ প্রশ্নের জবাব নেই। পানীগ্রাহীও খুঁজে পাননি। সেকেন্ডলি—ওই বিবের ফায়াল থেকে পঞ্চাশ গ্রাম বার করে নিয়ে কোন মুখ সেটা নিজের সুটকেসের সিক্রেট ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখবে? এটা বিশ্বাসযোগ্য?

রজদুলাল বলেন, কিন্তু সেখানেই তো ওটা পাওয়া গেছে। ওর তালাবন্ধ ঘরে, ওর তালাবন্ধ সুটকেসের সিক্রেট পকেটে কে সেটা লুকিয়ে রাখতে পারে বলুন? সে ছাড়া?

—আরও একজনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল। ঘরের চাবি যার হেপাজতে হামেহাল আসে, সুটকেসের চাবিটাও এবং স্বামীর সুটকেসে সিক্রেট পকেট কোথায় আছে, তা একজনের পক্ষেই জানা সম্ভব।

কর্নেল বলেন, অর্পিতা? বাঃ। তার কী স্বার্থ?

কৌশিক বলে, আমারও একবার তাই মনে হয়েছিল। এটা একটা সুপরিকল্পিত জয়েন্ট অ্যাডভেঞ্চার। দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায়। এটা ধরে নিলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রথমত, অনামিকা বিষমিশ্রিত পানীয়টা পান করছে স্বচক্ষে দেখেও কেন সমরেশ কাঁপিয়ে পড়ে বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সোমেশ্বর পানীয়টা হাত বাড়িয়ে নিয়েও কেন চুমুক দেয়নি? নানান কথাবার্তায় সে দেরি করাচ্ছিল আর ক্রমাগত—হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি...ক্রমাগত হাতের গ্লাসটা নাড়াচ্ছিল। যেমন করে জ্বামরা লেবুর সরবতে চিনি মিশিয়ে নাড়তে থাকি। তৃতীয়ত, কেন হত্যাকারী অতবড় কনক্রুসিড এভিডেন্সটা নিজের হেপাজতে লুকিয়ে রাখবে? বস্কেপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না? মানে পঞ্চাশ গ্রামের পুরিয়াটা বানানোর পর। ফোথলি, কী ভাবে ওটা ওর সুটকেসের সিক্রেট ড্রয়ারে স্থানলাভ করল? আমার শুধু একটা প্রশ্নের সমাধান হচ্ছিল না, কেন? হোয়াই? কী জন্যে? দুজনে জয়েন্টলি এ দুঃসাহসিক কাজটা কেন করবে? স্বার্থটা কার?

বাসু বললেন, পার্টনার-ইন-ক্রাইম দুজনেরই স্বার্থ এতে জড়িত। সোমেশ্বর তার ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে বরদাস্ত করে শুধু টাকার জন্য। বউটা মরে গেলে সেই একমাত্র ওয়ারিশ। কিন্তু স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হলে পুলিশ তাকেই সন্দেহ করবে—যেহেতু সেই একমাত্র ওয়ারিশ। তাই দুর্ঘটনাটা সর্বসমক্ষে হতে হবে। ওদিকে অর্পিতাও তার

ব্যভিচারী স্বামীকে নিয়ে বীতশ্রদ্ধ, বিরক্ত। অপরের সুন্দরী স্ত্রী দেখলেই সমরেশের মাথা ঘুরে যায়। নির্লজ্জ ব্যবহার করতে থাকে। সুতরাং অনামিকা-হত্যার অপরাধটা যদি ওই সমরেশের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ওদের কাউকেই আর কষ্ট করে ডিভোর্স নিতে হবে না। অনামিকার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যাবে ওরা—সোমেশ্বর আর অর্পিতা। অনামিকা মৃত, সমরেশ ফাঁসিতে ঝুলেছে।

পায়েল বলল, কিন্তু এ ষড়যন্ত্রটা ওরা করল কবে, কখন?

—গোপালপুর-অন-সি আসার অনেক আগে। কলকাতায়।

সুদীপা বলে, আপনার কি ধারণা ওরা আগে থেকেই পরস্পরকে চিনত?

—ধারণা নয় সুদীপা। আমি প্রমাণ দেব। সমরেশ কখনো অনামিকাকে দেখেনি। অনামিকাও দেখেনি অর্পিতাকে। তাদের ব্যবহারে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনামিকাকে প্রথম দেখে সমরেশের মাথা ঘুরে যায়। আবার অনামিকা প্রথম দর্শনে অর্পিতাকে চিনতে পারেনি। সুদীপাকে ভেবেছিল সমরেশের স্ত্রী। অথচ অর্পিতা আর সোমেশ্বর পরস্পরকে চিনত গোপালপুর-অন-সীতে আসার আগেই।

কর্নেল বলেন, সেটা কী করে বুঝলেন? কোনও প্রমাণ পেয়েছেন?

—একেবারে সেই প্রথম দিনের ঘটনাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে দেখুন। সোমেশ্বর এগিয়ে এসে আমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করল। বলল, সে শ্রুতিধর নয়, নামগুলো তার সব মনে থাকবে না। স্মরণ করে দেখুন, সে সময় সমরেশ উপস্থিত ছিল কিন্তু অর্পিতা তার জামা-কাপড় সুইমিং কস্টুম আনতে ঘরে গেছিল। সোমেশ্বর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। কর্নেল আগবাড়িয়ে পরিচয়গুলি করিয়ে দিচ্ছেন। সেই খণ্ডমুহূর্তটাকে স্মৃতির মণিকোঠা থেকে ফিরিয়ে আনুন। কর্নেল বললেন, কৌশিক-সুজাতার সঙ্গে আছে একটি ক্যুইট বাচ্চা। কী নাম যেন? সুজাতা বলেছিল, মিঠু। কর্নেল ‘ক্যুইট’ তুলে নিয়ে বলেন, “হ্যাঁ মিঠু। আর ইনি ব্রজদুলালবাবু। এসেছেন একাই। এছাড়া আছে আর একটি কাপল, সমরেশ আর...ওই তো, নাম করতে করতেই এসে পড়েছেন ওঁর বেটার হাফ।...” মনে করে দেখুন, কর্নেল সমরেশের কী উপাধি তা বলেননি। এরপর অনেকে অনেক কথা বলেছে। সোমেশ্বর সবাইকে এক-কোর্স করে ড্রিংক অফার করল। সুদীপা আর পায়েলকে পীড়াপীড়ি করে জিন নিতে বাধ্য করল। তারপর সে অর্পিতার দিকে ফিরে জানতে চাইল, সে কী নেবে? কিন্তু ঠিক কী ভাষায়? কী বলেছিল সে... বলুন? এনিবডি—

সকলেই মাথা নিচু করে ভাবছে। তিন দিন আগে একটি খণ্ডমুহূর্তের কথা মনে

করে বলা প্রায় অসম্ভব। রানী ইতস্তত করে বললেন, আমার যতদূর মনে পড়ে : সোমেশ্বর অর্পিতার দিকে ফিরে বলেছিল, আপনি কী নেবেন, মিসেস পালিত?

লাফিয়ে ওঠেন বাসু : একজ্যাস্টলি। হান্ডেড-পারসেন্ট কারেক্ট। নাউ আন্সার দ্যাট মিলিয়ান ডলার কোশ্চেন : সোমেশ্বর কেমন করে জানল সমরেশের বেটার হাফ : ‘পালিত’? বোস নয়, ঘোষ নয়, চ্যাটার্জি নয়, পতিতুণ্ড নয়? পালিত? পূর্বপরিচিতি ছাড়া এটা হয় না, হতে পারে না।

ব্রজদুলাল বললেন, কারেক্ট। ওদের নিশ্চয় পূর্বপরিচয় ছিল।

বাসু বলেন, আর সেটা গোপন করার চেষ্টাও প্রকট। আমার মনে আছে, অর্পিতা আমার কাছে একবার সোমেশ্বরের প্রসঙ্গে ‘মিস্টার ব্যানার্জি’ বলে পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বলেছিল ‘মিস্টার ঘোষাল’।

সকলে চুপ করে ভাবছে, কোথাও কোনও অসঙ্গতি আছে কি না।

বাসু আবার বলেন, অনামিকা আর সমরেশ যদি চিন্তা যায় সেদিন এই দুজন ষড়যন্ত্রকারী সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে ছিল। সোমেশ্বর আদৌ মদ্যপানে বেহুঁশ হয়নি, আর অর্পিতারও পেট কামড়ানো শুরু হয়নি। ওরা দুজন কায়দা করে বোকা দুটোকে চিন্তা পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি জানি না—আন্দাজ করছি—অর্পিতা আর সোমেশ্বর হয়তো তাদের প্রাকবিবাহ জীবনের প্রেমিক-প্রেমিকা। ব্রজদুলালবাবুর ওষুধ অর্পিতা আদৌ খাইনি। সে সোজা চলে গিয়েছিল সোমেশ্বরের ঘরে। নটা থেকে বারোটা সোমেশ্বরের বাহুবন্ধে সে জানতই না যে, তার হেপাজতে যে চাবিটা আছে তা ব্রজদুলালবাবুর ঘরের। মামলা যখন আদালতে উঠবে তখন এসব এভিডেন্স খুঁটিয়ে দেখা হবে। কোন দোকান থেকে সে কলকাতায় এস. টি. ডি করে। কত নম্বরে? কার সঙ্গে কথা বলে? পেটের ব্যথা সত্ত্বেও কেন সে টেলিফোন করতে যায়? কী জরুরি প্রয়োজন ছিল?

কর্নেল বলেন, দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত না?

বাসু বলেন, কী করে যাবে, বলুন? ওরা যে কীভাবে খুনের পরিকল্পনাটা ফেঁদেছে তা তো জানি না। আমি ক্রিমিনালদের জোড়টা ভাঙতে চেয়েছিলাম। অর্পিতা কলকাতা চলে গেলে সোমেশ্বর ঘাবড়ে যেত। একা হাতে অগ্রসর হতে সাহস পেত না। আর হয়তো সমরেশও ঘাবড়ে গিয়ে কলকাতা ছুটতো। কিন্তু অর্পিতা কিছুতেই স্থানত্যাগে রাজি হলো না। ফাঁসির দড়ি যেন ওকে টানছিল। ‘নিয়তি’ ছাড়া একে আর কী বলবেন বলুন?

সকলেই নতমস্তকে এই নতুন সমাধানটার কথা ভাবছে। বাসু-সাহেব উঠে

দাঁড়ালেন। বলেন, আর নয়, আপনারা সবাই গোপালপুর-অন-সীতে এসেছিলেন কেন? মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে নয়। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। সূর্যাস্ত হতে আরও পাঁচ-সাত মিনিট। আজ পশ্চিমাকাশে মেঘও নেই। সুতরাং : আউট যু গো, নেচার লাভার্স। সুদীপা-পায়েল তোমরা একদিকে যাও। এই ফুটকিটাকেও নিয়ে যাও সঙ্গে করে। মিঠু রানীর কাছে থাকবে। কৌশিক। সুজাতা। তোমরা যাও ওদিক পানে।

ওরা একে একে রওনা হয়ে পড়ে। কর্নেল সাহেবও লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠের ভঙ্গিতে এগিয়ে যান। ব্রজদুলাল বলেন, মিসেস রানী বাসুর মেমারি তো অসাধারণ। ঠিক বলে দিয়েছেন।

বাসু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, ও শুধু আমার সহধর্মিণীই নয়, শী ইজ মাই উইন্সাম ম্যারো।

ব্রজদুলাল হালে পানি পান না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গুঁর পড়া নেই। তিনি বিজ্ঞের হাসি হাসেন। কী করবেন? পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে এমন বিড়ম্বনা মাঝে মাঝে সইতেই হয়। রানী বৃদ্ধ বয়সেও রাঙিয়ে ওঠেন।

ব্রজদুলাল নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন : আপনার কী মনে হয়? সমরেশ আবার বিয়েথা করে সংসার পাতবে?

বাসু বলেন, জানি না। কেমন করে জানব?

রানী আগবাড়িয়ে বলেন, আমার বিশ্বাস সে আর ঘর-সংসার করতে চাইবে না। কাল সকালেই সে হয়তো ছাড়া পাবে। আমার ধারণা : জামিন নয়, পার্মানেন্টলি। গুঁরা চার্জ ফ্রেম করবেন অপরিতা আর সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে। কিন্তু হোটেলে ফিরে এসে সমরেশ বেচারি কারও দিকে চোখ তুলে চাইতে পারবে না।

বাসু বলেন, অপরিতা জনে জনে তার ব্যভিচারী স্বামীর কেচ্ছার কথা বলে বেড়াতে। চোখের জলে, কিন্তু রসিয়ে রসিয়ে। অথচ ভেবে দেখ : শিল্পীরা কখনো-সখনো অমন হয়ে থাকেন। পল গোগ্যা থেকে পাবলো পিকাসো কি তাঁদের প্রথমা পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে পেরেছিলেন?

ব্রজদুলাল বলেন, রাইট। আই পিটি হিম্।

—নো, স্যার।—প্রতিবাদ করে ওঠেন বাসু। সে শিল্পী, আপনার করুণার পাত্র নয়। স্বীকার করি : ও হরিপদ কেরানির চেয়েও বড় জাতের দুর্ভাগা :


ঘরেতে এসেছিল সে

কুচক্রী খুনীর বেশে

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

—তাহলে তো সে করুণারই পাত্র?—আবার বলেন ব্রজদুলাল।

--আজ্ঞে না। সমরেশ মাথা নিচু করে ফিরে যাবে তার খেলাৎবাবু লেনের বাসায়। প্রতিবেশীরা জানতে চাইবে, অর্পিতা কোথায়? ও জবাব দিতে পারবে না। কিন্তু মাঝরাতে ও উঠে যাবে ছাদে। মাদুর বিছিয়ে বসবে। তার সেতারে মুর্ছিত হবে সিন্ধু-বারোয়াঁর তান। সেই সুরের সপ্তমস্বর্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাবে, সমরেশ পালিত, হরিপদ কেবানি আর আকবর বাদশা।



এক বস্ত্রে দু'টি কাঁটা

নারায়ণ সান্যাল